গাছেরাও জানত না। পাখিরাও না।

শহর থেকে কাঠুরেরা কবে আসবে শুধু জানত মল্লিকবাবুদের বাড়ি।

কিন্তু লিপিরা, টুসিরা আর বিট্টুরা কেমন করে জানল?

একটা করে গাছকে জড়িয়ে ধরে সেদিন কিনা দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই!

কাঠুরেরা বলল, সরো। আমরা গাছ কাটব।

ওরা কেউ কথা বলল না।

মল্লিকবাবুর বড়ো ছেলে খবর পাঠাল পুলিশে। বড়ো দারোগা নিজেই এলেন সব শুনে। বাগান জুড়ে ছোটোদের দেখে তিনি তো হেসেই ফেললেন হোঃ হোঃ করে!

বললেন, না-না। আমি তোমাদের ধরতে আসিনি।

তাহলে?

বড়ো দারোগা একটা সেপাইকে ডেকে বললেন, যাও, এদের সবার জন্যে চকলেট নিয়ে এসো দুটো করে।

কাঠুরেরাও হাঁ হয়ে গেল তখন!

—শোনো, বড়ো দারোগা লিপির দু-কাঁধে হাত রেখে বললেন, কেউ তোমাদের একটাও গাছ কাটতে পারবে না এখান থেকে। বুঝলে? আমার হুকুম।

কথাটা শুনেই আনন্দে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল লিপির।

গাছের ডালে ডালে বসেছিল পাখিরা।

টিয়া বলল, আমরা ওদের কিছু দেব না?

বাবুইগিন্নি মুচকি একটু হেসে বলল, দেব বইকি! এই সময় তো জুঁই ফুলের মেলা। যাও—তোমরা যে যা পারো তুলে নিয়ে এসো আমার কাছে।

বেনেবউ বলে, কী করবে অত ফুল দিয়ে?

বাবুইগিন্নি মুখের ভাবখানা বড়ো দারোগার মতো করে বলল, ওদের জন্যে রুমাল বুনব একটা করে। ছোটো ছোটো রুমাল।

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ লিপিকে দেখলে কারা খুশি হয়?
১.২ খুশি হয়ে তারা কী করে?
১.৩ লিপিদের বাড়ি কোথায়?
১.৪ বাড়ির পাশের বাগানটা কাদের?
১.৫ লিপি কখন বাগানে যায়?
১.৬ তার সঙ্গে কে কে থাকে?
১.৭ চারাগাছ কোথায় খুশিতে হিলহিলিয়ে ওঠে?
১.৮ লিপি কোথায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে গাছ বসায়?
১.৯ মাঝিপাড়ার ছাগল তিনটে বিদঘুটে কেন?
১.১০ বাগানের খরগোশ দুটো কেমন?
১.১১ ড্রয়িং খাতায় লিপি কী-সব ছবি এঁকেছে?
১.১২ কাঠবেড়ালি বউ কোথা থেকে, কী শুনেছিল?
১.১৩ শানুর বাবা কী বলেছিলেন?
১.১৪ কাদের দেখে পাখিরা চেঁচিয়েমেচিয়ে উঠল?
১.১৫ লিপি কাদের কানে কানে কথা বলেছিল?
১.১৬ কাঠুরেরা এলে লিপিরা কী করল?
১.১৭ কে পুলিশে খবর দিল?
১.১৮ কে লিপিদের উপহার দিতে চাইল?
১.১৯ বাবুইগিন্নি কী উপহার দিয়েছিল?
১.২০ জুঁই ফুল কোন ঋতুতে ফোটে?

কার্তিক ঘোষ (জন্ম ১৯৫০) : বিখ্যাত কবি ও ছড়াকার। ইস্কুল জীবন থেকে লেখালেখি শুরু। উল্লেখযোগ্য বই ‘একটা মেয়ে একা’, ‘হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম’, ‘আমার বন্ধু গাছ’, ‘দলমা পাহাড়ের দুলকি’ ‘এ কলকাতা সে কলকাতা’, ‘জুঁইফুলের রুমাল’ প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ ‘শ্রেষ্ঠ কিশোর কল্পবিজ্ঞান’, ‘সেরা রূপকথার গল্প’, ‘সেরা কিশোর অ্যাডভেঞ্চার’ প্রভৃতি। ১৯৭৬-এ ‘টুম্পুর জন্য ’ লেখাটির জন্য সংসদ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯৩-এ পান ‘শিশু সাহিত্য জাতীয় পুরস্কার’। এছাড়াও পেয়েছেন ‘তেপান্তর’ ও ‘সুনির্মল স্মৃতি পুরস্কার’।

শব্দার্থ : ডগমগ—মাতোয়ারা, আত্মহারা। কাঁচামিঠে—কাঁচা হলেও মিঠে। বিদঘুটে—বদখত, ছন্নছাড়া। মুড়িয়ে দেওয়া—মুণ্ডন করা, ন্যাড়া করে দেওয়া। ড্রয়িং খাতা—ছবি আঁকার খাতা। নেমন্তন্ন—নিয়ন্ত্রণ, দাওয়াত। বড়ো দারোগা— কোনো থানার পুলিশ প্রধান। ঝাপসা—অস্পষ্ট। মুচকি—মৃদু। গিন্নি—গৃহিণী, বউ।

১. নীচের শব্দঝুড়ি থেকে শব্দ নিয়ে ঠিক স্তম্ভে বসাও :

গাছ	পাখি

শাল, শালিক, বাবুই, কদম, ছাতারে, বেনেবউ, আকাশমণি, টিয়া, কৃষ্ণচূড়া, জামরুল, চন্দনা, সেগুন, জাম, টুনটুনি, বকুল, চাঁপা, কামরাঙা, আম

এগরা : পূর্ব মেদিনীপুরের একটি জায়গা। কাঁথির উত্তরে অবস্থিত এই জায়গাটি এখন একটি শহর হয়ে উঠেছে।

বাবুইপাখি: ছোটো এক ধরনের পাখি। ঠোঁট দিয়ে খড়-কুটো-পাতা চমৎকার সেলাই করে বাসা বানায়। এইজন্য এদের ‘দরজিপাখি’ বলা হয়। বাবুইগিন্নি লিপি ও তার বন্ধুদের জুঁইফুল সেলাই করে ছোটো ছোটো রুমাল বানিয়ে দিয়েছিল।

চিপকো আন্দোলন : লিপি আর তার বন্ধুরা যেভাবে গাছেদের জড়িয়ে ধরে গাছ কাটা আটকে দিয়েছিল, এমন ঘটনা কিন্তু সত্যি সত্যিই আগে ঘটেছে। আমাদের দেশেই। ১৭৩১ সালে রাজস্থানের যোধপুরের কাছে খেজারলি গ্রামে বিশনোই সম্প্রদায়ের ৩৬৫ জন মানুষ প্রথম অমৃতা দেবীর নেতৃত্বে ঠিক এইভাবে গাছ কাটায় বাধা দেন। ১৯৭৪ সালে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়োয়াল হিমালয়ের চামোলি জেলায় হেমওয়ালঘাটির রেনি গ্রামের মানুষ বন দফতরের নির্দেশ না মেনে গাছেদের জড়িয়ে ধরেন। হিন্দিতে ‘চিপকো’ শব্দের মানে ‘জড়িয়ে ধরো’। গাছ বাঁচানোর এই আন্দোলন ক্রমে খুব জনপ্রিয় হয় এবং গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে মানুষরা অরণ্যে বা অরণ্যের কাছাকাছি থাকেন, তাঁরাই সে দেশের অরণ্যকে রক্ষা করেন। অরণ্যের ওপর তাঁদের অধিকারও এইসময় থেকে আইন অনুসারে স্বীকৃত হয়।

২. গাছ কাটার ব্যাপারে লিপি আর বিট্টু তাদের বন্ধুদের আগেই কানে কানে কিছু কথা বলে এসেছিল। কে কাকে বলেছিল মনে রেখে নির্দিষ্ট খোপে তাদের নাম বসাও।

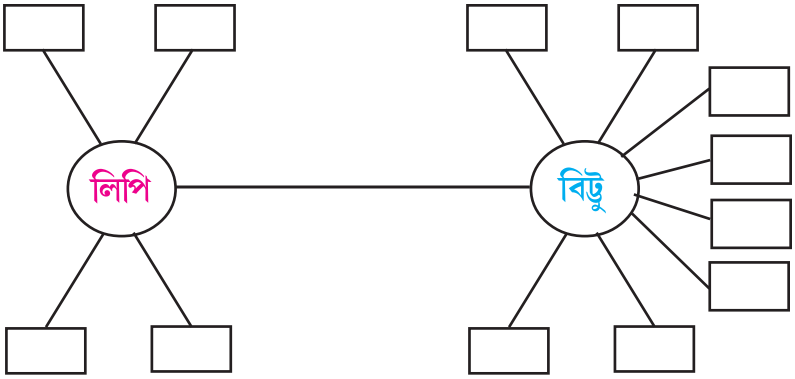

৩. এই গল্পে মোট চারটি পশুর নাম আছে। কাঠবেড়ালি, ছাগল, খরগোশ আর পুষি বেড়াল। এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটি করে বাক্য লেখো।

৪. এই গল্পে যে সব গাছ আর পাখির নাম আছে, তাদের নিয়েও একটি করে বাক্য লেখো। এছাড়াও তোমার জানা আরও কিছু গাছ আর পাখির নাম লেখো।

৫. এই গল্প পড়ে লিপিকে তোমার কেমন লেগেছে? যদি ভালো লাগে তবে কেন ভালো লেগেছে বুঝিয়ে বলো।

৬. বড়ো দারোগাবাবু লোকটা কেমন?

৭. নীচে এমন কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো যারা গাছের বন্ধু, আর কয়েকজনের নাম থাকল যারা গাছের শত্রু। যারা বন্ধু তাদের নাম গাছের আশেপাশে লেখো, আর যারা বন্ধু নয় তাদের নাম সরিয়ে অন্য একদিকে লেখো :

- লিপি
- মল্লিকবাবু
- টুসি
- মাঝিপাড়ার ছাগল
- সুধাদিদি
- বেনে বউ
- বড়ো দারোগা
- বাবুইগিন্নি
- পল্টন

- বিট্টু
- খরগোশ
- দোলন
- কাঠবেড়ালি
- শানুর বাবা
- কাঠুরে
- গাবলু
- সেপাই
- মল্লিকবাবুর বড়ো ছেলে

সাথি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তেপান্তর মাঠ—চারিদিকে ধুধু করছে, তার মাঝে একটি তালগাছ, সে একলা বাড়ল। দূরে দূরে মাঠ-ঘেরা বন, সেখানে লতাপাতা সব গলাগলি করে আছে দেখা যায়—ঘন নীল ছায়ার মতো। মাঠের চেয়ে বড়ো আকাশ—সেখানে তারা সব ঘেঁষাঘেঁষি ঝিলমিল করছে দেখা যায়—কেউ একা নেই। হাওয়া আসে, তার সঙ্গে আসে তার সাথি ফুলের গন্ধ। ঝড় আসে, তার সঙ্গে তার সাথি আসে আঁধি আর বৃষ্টি। মেঘ আসে, তার সঙ্গে আসে বিদ্যুল্লতা অপরূপ সুন্দরী!—সাথি ছাড়া কেউ নেই। শরতের মেঘ—তাদের সাথি হয়ে চলে বলাকা—পারিজাতের হারের মতো সার বেঁধে যায় দলে দলে সাথি আর সেথো তারা!

তালগাছ কেবলই তাদের ডাকে—পাতাগুলো নেড়ে নেড়ে; কিন্তু তাকে একলা রেখে যে-যার দৌড়ে পালায়, খেলতে ছোটে। তেপান্তর মাঠে একলা গাছ নিশ্বাস ফেলে—বৃথা আঁকুপাঁকু করে—তাদের সঙ্গে চলতে চায়—পারে না।

একদিন কোথা থেকে দুটি বাবুইপাখি সেই তালগাছের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। পাতার উপর বসে তারা দুটিতে মিছিমিছি কত কী বকাবকি করে। তারপর একদিন মাঠের থেকে কুটোকাটা নিয়ে তালগাছের প্রাণ যেখানে বাতাসে ঝিলমিল করে সেইখানে চমৎকার করে তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়।

তালগাছ তাদের দোলা দেয় আর মনে মনে বলে—মিলল, সাথি মিলল!

তারপর একদিন খেলাঘর ছেড়ে ছোটো ছোটো পাখি তারা একে একে উড়ে যায়। সবুজ পাতার গাঁথা শূন্য বাসা নিয়ে তালগাছ দোলা দেয় আর চুপ করে কী যেন ভাবে থেকে থেকে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি তোমাদের জন্য রইল।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : তেপান্তর — তিনটি প্রান্তর যেখানে এসে মিলেছে, খুব বড়ো মাঠ। ধু ধু — ফাঁকা, শূন্য। ঝিলমিল — ঝিকমিক করা। সাথি — সঙ্গী, বন্ধু। আঁধি — ধূলিঝড়। বিদ্যুল্লতা — লতার মতো দেখতে বিদ্যুৎ, বিজলি। অপরূপ — যার রূপের তুলনা হয় না। বলাকা — পাখির ঝাঁক। পারিজাত — কাল্পনিক ফুল। সেথো — সঙ্গী, সাথি, বন্ধু। বৃথা — ব্যর্থ, বিফল। মিছিমিছি — শুধু শুধু, এমনি এমনি। কুটোকাটা — খড়কুটো, ডালপালা।

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ তালগাছ কোথায় একলা বাড়ল?
১.২ ঘন নীল ছায়ার মতো কাদের দেখা যায়?
১.৩ মাঠের চেয়ে বড়ো কে?
১.৪ হাওয়ার সঙ্গে কে আসে?
১.৫ ঝড়ের সঙ্গে কে কে আসে?
১.৬ শরতের মেঘের সাথি কে?
১.৭ তালগাছ কেন বৃথা আঁকুপাঁকু করে?
১.৮ তালগাছের কাছে কারা যাওয়া আসা করতে লাগল?
১.৯ বাবুই পাখিরা কোথায় বাসা বাঁধল?
১.১০ তালগাছ চুপ করে ভাবে কেন?

২. **উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :**

২.১ চারিদিকে ——— [ধু ধু / হু হু] করছে।
২.২ সেখানে লতাপাতা সব ———[দলাদলি / গলাগলি] করে আছে।
২.৩ সেখানে তারা সব ঘেঁষাঘেঁষি ———[ঝিলমিল / কিলবিল] করছে।
২.৪ তারা দুটিতে মিছিমিছি কত কী ———[হাঁকাহাঁকি / বকাবকি] করে।
২.৫ মাঠের থেকে ———[এঁটোকাঁটা / কুটোকাটা] নিয়ে বাসা বাঁধে।

৩. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো :**

তেপান্তর, বলাকা, আঁকুপাঁকু, মিছিমিছি, ঝিলমিল।

৪. **একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

নীড়, ভর্ৎসনা, গগন, প্রান্তর, বিজলি।

৫. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

ঘন, দূরে, আছে, ছোটো।

৬. **'হার' শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য লেখো।**

৭. **টীকা লেখো :** শরতের মেঘ, তালগাছ।

৮. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** বিশ্বাস, কুটোকাটা, বলাকা, দুটি।

৯. **যুক্তাক্ষর রয়েছে এমন পাঁচটি শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।**

১০. **বাক্য বাড়াও :**

১০.১ তার মাঝে একটি তালগাছ। (কোথায়? কেমন?)

১০.২ ঝড় আসে। (কাকে নিয়ে?)

১০.৩ তালগাছ কেবলই ডাকে। (কাদের? কীভাবে)

১০.৪ একলা গাছ বৃথা আঁকুপাঁকু করে। (কেন?)

১০.৫ তারপর একদিন তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়। (কারা? কোথায়? কী দিয়ে?)

১১. শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তালগাছ' কবিতাটি এই পাঠের শেষে মিলিয়ে পড়ো।

১২. তোমার সবথেকে প্রিয় বন্ধু সম্বন্ধে চার-পাঁচটি বাক্য লেখো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ - ১৯৫১) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ বা অবন ঠাকুর ছিলেন খুব বড়ো মাপের একজন আঁকিয়ে। তিনি যেমন ভালো ছবি আঁকতেন, তেমন চমৎকার করে লিখতেও পারতেন। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলি বাঙালির অক্ষয় সম্পদ। বাংলাদেশের আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, রূপকথা তাঁর লেখায় নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্রীর দেশ' ইত্যাদি তাঁর লেখা ছোটোদের কতগুলি বই। আর বড়োদের জন্য তিনি লিখেছেন 'ভারতশিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' ইত্যাদি।

১৩. নীচের ছবিদুটির মধ্যে অন্তত ছটি অমিল খুঁজে বের করো :

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

সমাধান :

১. বাবুই পাখির বাসার সংখ্যা কম ২. তালগাছের সংখ্যা কম ৩. মেঘের সংখ্যা কম ৪. পাখির সংখ্যা কম ৫. কচু পাতার সংখ্যা কম ৬. ঘরের সংখ্যা কম।

একা একা থাকতে নেই

প্রচলিত গল্প

একদল পরি। তারা খোলা আকাশের নীচে গাছের ডালে ডালে থাকে। রোদে দেহ পুড়ে যায়, বৃষ্টিতে দেহ ভিজে যায়, শীতকালের হিমেল বাতাসে দেহ কাঁপতে থাকে। বড়ো কষ্ট।

এমনি করে দিন কাটে। একদিন তারা সবাই মিলে ঠিক করল, তারা বাড়ি তৈরি করবে। বাড়ির মধ্যে থাকলে আর কষ্ট হবে না। সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

কয়েকজন পরি বলল, চলো আমরা গভীর বনে যাই। সেখানে একসঙ্গে অনেক বড়ো বড়ো মজবুত গাছ আছে। সেসব ডালে বাড়ি তৈরি করলে আর কোনো ভাবনা নেই।

দুজন পরি বলল, গভীর বনে যেতে যাব কেন? এই তো বেশ ফাঁকা ফাঁকা মাঠে গাছ রয়েছে, ওখানেই বাড়ি তৈরি করব।

কয়েকজন গভীর বনে চলে গেল। গাছের গুঁড়ি থেকে অল্প উঁচুতে কয়েকটা ডালের মাঝখানে সুন্দর বাড়ি তৈরি করল। আর কোনো কষ্ট নেই।

দুজন ফাঁকা মাঠে পাশাপাশি গাছে বাড়ি তৈরি করল। চারিদিকেই বেশ ফাঁকা, গভীর বনের মতো নয়।

এমনি করে দুই জায়গায় আনন্দে দিন কাটে, রাত কাটে। কোনো দুর্ভাবনাই নেই। তাদের মনে সব সময় খুশির হাওয়া।

সব দিন সমান যায় না। কখন যে বিপদ এসে পড়ে, কেউ বলতে পারে না। একদিন হলোও তাই। বড়ো বিপদ, আচমকা এসে পড়ল।

একদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি ঝরছে। তারপর এল বর্ষার রাত। হঠাৎ দমকা হাওয়া দিয়ে পাহাড়ি ঝড় শুরু হলো। হাওয়ার দাপটে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। মাঠের গাছপালা কাঁপতে লাগল।

ঘন বনের মধ্যে একসঙ্গে অনেক গাছ। ফাঁকা জায়গা কম। তাই সেখানে ঝড়-ঝাপটা তেমন সুবিধে করতে পারল না। শুধু গাছের কয়েকটা ডাল ভেঙে পড়ল। বনের পরিদের বাড়ি বেঁচে গেল।

তারা বলল, সবার উচিত ঘন বনভূমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, একা একা থাকলেই বিপদ। ওদের গাছগুলো আলাদা আলাদা ছিল, ভেঙে পড়ল। একা একা থাকতে নেই। তাতে শক্তি কমে যায়। একসঙ্গে থাকলে শক্তি বাড়ে।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : একদল — একসঙ্গে অনেকজন। পরি — রূপকথার কল্পিত সুন্দরী মেয়ে, যাদের পাখির মতো ডানা আছে। হিমেল — ঠান্ডা। দুর্ভাবনা — খারাপ চিন্তা, দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ। খুশির হাওয়া — আনন্দের অনুভূতি। বিপদ — সংকট, ঝঞ্ঝাট। আচমকা— চমকানি লাগে এমন, হঠাৎ। দমকা হাওয়া — হঠাৎ জোরে ছুটে আসা হাওয়া। দাপট — প্রতাপ। ওলট-পালট — সম্পূর্ণ বদল, বিপর্যয়। ঝড়-ঝাপটা — জোরালো বাতাসের ঢেউ ও হঠাৎ ধাক্কা। ঘন বন — গভীর অরণ্য। মিলেমিশে — সদ্‌ভাব, সম্প্রীতি। বনভূমি — বনের এলাকা। শক্তি— ক্ষমতা।

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ পরিদের বাড়িতে থাকা সুবিধাজনক মনে হয়েছিল কেন?

১.২ বাড়ি তৈরির জায়গা নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হলো কেন?

১.৩ তারপর তারা কী কী করল?

১.৪ বৃষ্টিতে পরিদের মাঠের গাছ-বাড়িগুলোর কী অবস্থা হলো?

১.৫ ঘন বনে ঝড়-ঝাপটা তেমন সুবিধা করতে পারল না কেন?

১.৬ বনের পরিদের বাড়ি কীভাবে বেঁচে গেল?

১.৭ একা একা থাকার বিপদ কোথায়?

এই লোককথাটি গড়ে উঠেছে কী করা উচিত আর কোনটা অনুচিত, তা গল্পের ছলে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এখানে পরিদের আড়ালে মানুষের কথাই রয়েছে। তবে একতাই যে বল, আলাদা হয়ে থাকা বিপদের কারণ—এই গল্পে এই যে কথাটা বলা হয়েছে, সেটা সব দেশে, সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

২. বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটা বেছে লেখো :

২.১ পরির দল খোলা আকাশের নীচে (গাছের ডালে ডালে / গাছের কোটরে কোটরে) থাকে।

২.২ গাছের গুঁড়ি থেকে (অল্প / অনেক) উঁচুতে কয়েকজন পরি বাড়ি তৈরি করল।

২.৩ যেদিন ঝড় উঠল, সেদিন ছিল (বর্ষার রাত / শীতের রাত)।

২.৪ ঘন বনে গাছগুলো (কাছাকাছি / ছাড়াছাড়া হয়ে) থাকে।

২.৫ (একসঙ্গে / আলাদা ভাবে) থাকলে শক্তি বাড়ে।

৩. **পরি, পাহাড়ি ঝড় এবং গাছবাড়ি সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখো :**

৪. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

বাড়ি, হাওয়া, গাছ, বন, হিমেল।

৫. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

একদল, নীচে, ভিজে, দিন, সুখ, শান্তি, গভীর, অল্প, সুন্দর, খুশি, অনেক, আলাদা আলাদা

৬. **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :**

৬.১ পরিরা গাছের ডালে______ (থাকে / থাকি)

৬.২ তারা বাড়ি তৈরি______ (করব / করবে)

৬.৩ একসঙ্গে থাকলে শক্তি______ (বাড়ে / বাড়ায়)

৭. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

ল ত কা শী, চ কা ম আ, ছ পা লা গা, মি ন ভূ ব, টা ঝ প ড় ঝা।

৮. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

আকাশ, চারিদিক, আনন্দ, বর্ষা, মিলেমিশে

৯. **অর্থ লেখো :**

দেহ, গভীর, দমকা, আচমকা, দুর্ভাবনা।

১০. **এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো :**

১০.১ নেই একা থাকতে একা।

১০.২ একসঙ্গে বনের অনেক ঘন গাছ মধ্যে।

১০.৩ হাওয়া খুশির মনে তাদের সবসময়।

১০.৪ চলে বনে গেল গভীর কয়েকজন।

১০.৫ একসঙ্গে বাড়ে থাকলে শক্তি।

১১. **গল্পের ঘটনাগুলি সাজিয়ে লেখো :**

১. তারা বলল, সবার উচিত ঘন বনভূমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, একা একা থাকলেই বিপদ।

২. বনের পরিদের বাড়ি বেঁচে গেল।

৩. হঠাৎ দমকা হাওয়া দিয়ে পাহাড়ি ঝড় শুরু হলো।

৪. একদল পরি।...একদিন তারা সবাই মিলে ঠিক করল, তারা বাড়ি তৈরি করবে।

৫. দুজন পরি বলল, গভীর বনে যেতে যাব কেন? এই তো বেশ ফাঁকা ফাঁকা মাঠ রয়েছে, ওখানেই বাড়ি তৈরি করব।

১২. লক্ষ করো, এক শব্দের দুবার প্রয়োগ কীভাবে অনেক বোঝাচ্ছে। এইরকম জোড়া শব্দের অর্থ তুমি লেখো : (একটা করে দেওয়া হলো)

ডালে ডালে — অনেকগুলি ডালে।

বড়ো বড়ো

ফাঁকা ফাঁকা

১৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১৩.১ পরিরা কোথায় থাকত?

১৩.২ তাদের কী কারণে কষ্ট হতো?

১৩.৩ কষ্ট থেকে রেহাই পেতে তারা কী ভাবল?

১৩.৪ পরিরা কোথায় যেতে চাইল?

১৩.৫ দুজন পরি কী বলল?

১৩.৬ পরিরা কোথায় কোথায় তাদের বাড়ি তৈরি করেছিল?

১৩.৭ সেখানে তাদের কীভাবে দিন কাটছিল?

১৩.৮ ‘সব দিন সমান যায় না’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

১৩.৯ বর্ষার রাতে কী ঘটল?

১৩.১০ ‘ঘন বন’ আর ‘মাঠ’ — এই দুই জায়গায় থাকা পরিদের কী দশা হলো?

১৩.১১ শেষে ঘন বনের পরিরা কী বলল?

আরাম

শঙ্খ ঘোষ

ঘুম ভেঙে দেখি আজ
পাখিদের কূজনে
বাবা আছে মা-ও আছে
দুই পাশে দুজনে।
ওই ঘরে ঘুমভরে
জিজি আছে বেঘোরে
পুতুলেরা টুংটাং
নেচে ওঠে এ ঘরে।

এদিকে আজান আর
ওইদিকে সিয়ারাম
সব আছে ঠিকঠাক
আঃ! আজ কী আরাম!

হাতে কলমে

১. এক কথায় উত্তর দাও :

১.১ কূজন কী?

১.২ কীভাবে ঘুম ভাঙল?

১.৩ ঘুম ভেঙে কী দেখা গেল?

১.৪ জিজি আর পুতুলেরা কী করছে?

১.৫ 'কী আরাম'— কখন এমন মনে হলো ?

১.৬ সব কিছু ঠিকঠাক মনে হলো কখন?

শব্দার্থ : কূজন — কাকলি, পাখির ডাক। জিজি — দিদি। বেঘোর — বেহুঁশ বা অচেতন। টুংটাং — একরকম আওয়াজ বা শব্দ, এখানে বাজনার শব্দ বোঝাচ্ছে। আরাম — স্বস্তি বোধ করা। সিয়ারাম — সীতারাম শব্দ থেকে এসেছে। আজান — নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান ধ্বনি।

২. যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো :

২.১ কবিতাটিতে (ভোরবেলার / রাত্রিবেলার) কথা বলা হয়েছে।

২.২ পুতুলেরা (এঘরে / ওঘরে) নেচে উঠেছে।

২.৩ (আজ / কাল) কী আরাম।

৩. কবিতাটি পড়ে বাক্য সম্পূর্ণ করো :

৩.১ আজ ঘুম ভেঙে দেখি ____।

৩.২ পুতুলেরা ____ নেচে ওঠে এ ঘরে।

৩.৩ ওইদিকে শোনা যায় ____ ।

৩.৪ ওই ঘরে জিজি ____ ঘুমায়।

৪. **শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

কূজন, টুংটাং, বেঘোরে, আরাম

৫. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

ঘুম, ভেঙে, ঘরে, আজ, ওঠে।

৬. **শব্দঝুড়ি থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :**

৬.১ রোজ সকালে আমাদের ঘুম ____ ।

৬.২ বাবা-মা আমাদের ____ ।

৬.৩ আনন্দে মন ____ ওঠে।

৬.৪ প্রচণ্ড গরমে ____ নেই।

আরাম, ভাঙে, ভালোবাসেন, নেচে

শঙ্খ ঘোষ (জন্ম ১৯৩২) : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'। এছাড়াও লিখেছেন 'নিহিত পাতাল ছায়া', 'বাবরের প্রার্থনা', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— 'ছোট্ট একটা স্কুল', 'অল্পবয়স কল্পবয়স', 'শব্দ নিয়ে খেলা', 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরি বনের সারি', 'শহর পথের ধুলো' ইত্যাদি। প্রবন্ধের বই হিসেবে 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', 'ছন্দোময় জীবন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭. কোন কোন পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে?

৮. সকালে উঠে কীভাবে তুমি দিন শুরু করো, চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো।

হিংসুটি

সুকুমার রায়

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে — বেজায় হিংসুটে, আর বেজায় ঝগড়াটি। তার নাম বলতে গেলেই তো মুশকিল, কারণ ঐ নামে শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকে, তারা তো আমার উপর চটে যাবে।

হিংসুটির দিদি বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজে কর্মে, তেমনি লেখাপড়ায়। হিংসুটির বয়েস সাত বছর হয়ে গেল, এখনও তার প্রথম ভাগই শেষ হলো না— আর তার দিদি তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়ো, সে এখনই 'বোধোদয়' আর 'ছেলেদের রামায়ণ' পড়ে ফেলেছে। ইংরেজি ফার্স্টবুক তার কবে শেষ হয়ে গেছে। হিংসুটি কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তো দিদিকেও হিংসে করত। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটি খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি যে-বার ছবির বই প্রাইজ পেল আর হিংসুটি কিচ্ছু পেলে না, তখন যদি তার অভিমান দেখতে! সে সারাটা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে রইল—কারও সঙ্গে কথাই বলল না। তারপর রাত্রিবেলায় দিদির অমন সুন্দর বইখানাকে কালি ঢেলে, মলাট ছিঁড়ে, কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটি মেয়ে!

হিংসুটির মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু-বোনকেই আদর করে খেতে দিয়েছেন। হিংসুটি খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী রে, কী হলো? জিভে কামড় লাগল নাকি?' হিংসুটির মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদছে। তখন তার মা এক ধমক দিয়ে বললেন 'কী হয়েছে বল না!' তখন হিংসুটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দিদির ঐ রসমুন্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়ো।' তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুন্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটি নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্ধেক সে খেতে পারল না—নষ্ট করে ফেলে দিল। দিদির জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন জামা, নতুন কাপড় এলে হিংসুটি তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে।

একদিন হঠাৎ হিংসুটি তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কী— লাল জামা গায়ে, লাল জুতো পায়ে, টুকটুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটি বলল, 'দেখেছ! দিদি কী দুষ্টু! নিশ্চয়ই মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় করেছে– আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে!' তখন তার ভয়ানক রাগ হলো। সে ভাবল, 'আমি তো ছোটো বোন, আমারই তো পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে?' এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কী সুন্দর পুতুল! কেমন মিটমিটে চোখ, আর ফুটফুটে মুখ, কেমন কচি কচি হাত পা, আর টুকটুকে জামা কাপড়! যত সব ভালো ভালো জিনিস সব কিনা দিদি পাবে! হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ গেল না; সে একটা ডান্ডা নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পুতুলটাকে মারতে লাগল। মারতে মারতে তার নাক মুখ হাত পা ভেঙে, তার জামা কাপড় ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেলবেলা মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বললেন, 'তোর জন্য কী এনেছি দেখিসনি?' শুনে হিংসুটি দৌড়ে এল, 'কই মামা? কী এনেছ দাও না।'

মামা বললেন, 'মার কাছে দেখ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।' হিংসুটি উৎসাহে নাচতে লাগল, মাকে বলল, 'কোথায় রেখেছ মা?' মা বললেন, 'আলমারিতে আছে।' শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে উঠল। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পরানো—মাথায় কালো কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল?' মা বললেন, 'হ্যাঁ। তুই দেখেছিস নাকি?'

হিংসুটির মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এরপরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আর কী করে কমবে?

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ হিংসুটির নাম বলা মুশকিল কেন?
১.২ হিংসুটির দিদি কেমন মেয়ে?
১.৩ হিংসুটির বয়স কত?
১.৪ হিংসুটির দিদির বয়স কত?
১.৫ হিংসুটির দিদি কী কী পড়ে ফেলেছে?
১.৬ স্কুলে কে কেমন ফল করত?
১.৭ দিদি ছবির বই প্রাইজ পেলে হিংসুটি কী করল?
১.৮ হিংসুটি দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে কাঁদল কেন?
১.৯ দিদির জন্মদিনে হিংসুটি কী করে?
১.১০ একদিন হঠাৎ হিংসুটি মায়ের আলমারি খুলে কী দেখল?
১.১১ হিংসুটির ভয়ানক রাগ হলো কেন?
১.১২ কেন হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল?
১.১৩ কে, কাকে ডান্ডা দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে মারতে লাগল?
১.১৪ মারার পর সে কী করল?
১.১৫ মামা কখন হিংসুটিকে ডাকতে লাগলেন?
১.১৬ মামা হিংসুটিকে ডেকে কী বললেন?
১.১৭ হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে উঠল কেন?
১.১৮ সে কাঁদো কাঁদো গলায় কী বলল?
১.১৯ হিংসুটির কথা শুনে মা কী বললেন?
১.২০ হিংসুটি ভ্যাঁ করে কেঁদে একদৌড়ে পালিয়ে গেল কেন?

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩): 'আবোল তাবোল', 'হযবরল', 'পাগলা দাশু' ইত্যাদির স্রষ্টা সুকুমার রায়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রত্যেক বাঙালির শৈশবে জড়িয়ে আছেন এই কবি ও সাহিত্যিক। চিত্রশিল্প, ফটোগ্রাফি, সরস ও কৌতুককর কাহিনি এবং ছড়া রচনায় সুকুমার রায় অতুলনীয়। তাঁর রচিত অন্যান্য বই— 'খাই খাই', 'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি। স্বল্পদিনের জীবনে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তা থেকে বাঙালি জাতি চিরদিন অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাবে।

২. **‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :**

ক	খ
মিটমিটে	জামাকাপড়
ফুটফুটে	গলা
কচি কচি	চোখ
টুকটুকে	মুখ
কাঁদো কাঁদো	হাত পা

শব্দার্থ : হিংসুটে — যে অন্যকে হিংসে করে। ঝগড়াটি — যে খালি ঝগড়া করে। প্রাইজ — পুরস্কার। রসমুন্ডি — একরকমের মিষ্টি। ডান্ডা — লাঠি।

৩. **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ হিংসুটি তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে ________ (কেঁদে ফেলল / হেসে ফেলল / খেয়ে ফেলল)।

৩.২ সে একটা ডান্ডা দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পুতুলটাকে ________ (আদর করল / মারতে লাগল / স্নান করাল)।

৩.৩ সে ________ (আনন্দে / দুঃখে / রাগে) গরগর করতে করতে চলে গেল।

৩.৪ শুনে ________ (হিংসায় / ভয়ে / করুণায়) হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

৩.৫ সে কাঁদো কাঁদো ________ (গলায় / মুখে / চোখে) বলল।

৩.৬ সে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে ________ (শুনে / তাকিয়ে / ছুঁয়ে) একদৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

৪. **কোনটি বেমানান খুঁজে বের করে গোল দাগ দাও :**

৪.১ দুষ্টু, শান্ত, হিংসুটে, ঝগড়াটি।

৪.২ বোধোদয়, ছেলেদের রামায়ণ, রসমুন্ডি, ইংরেজি ফার্স্টবুক।

৪.৩ নাচতে নাচতে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, গাল ফুলিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে।

৪.৪ মা, মামা, দিদি, হিংসুটি।

৪.৫ বাক্স, আলমারি, মলাট, পুতুল।

৫. হিংসুটির দিদিকে ‘লক্ষ্মী মেয়ে’ বলা হয়েছে কেন?

৬. মামার দেওয়া পুতুলটা কেমন ছিল? সেটা কোথায় রাখা ছিল?

৭. তুমি কি হিংসুটির মতো হতে চাও? কেন চাও বা চাও না, তা লেখো।

৮. ‘হিংসে করা ভালো নয়’ — এই বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

৯. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে খেলাটি খেলো :

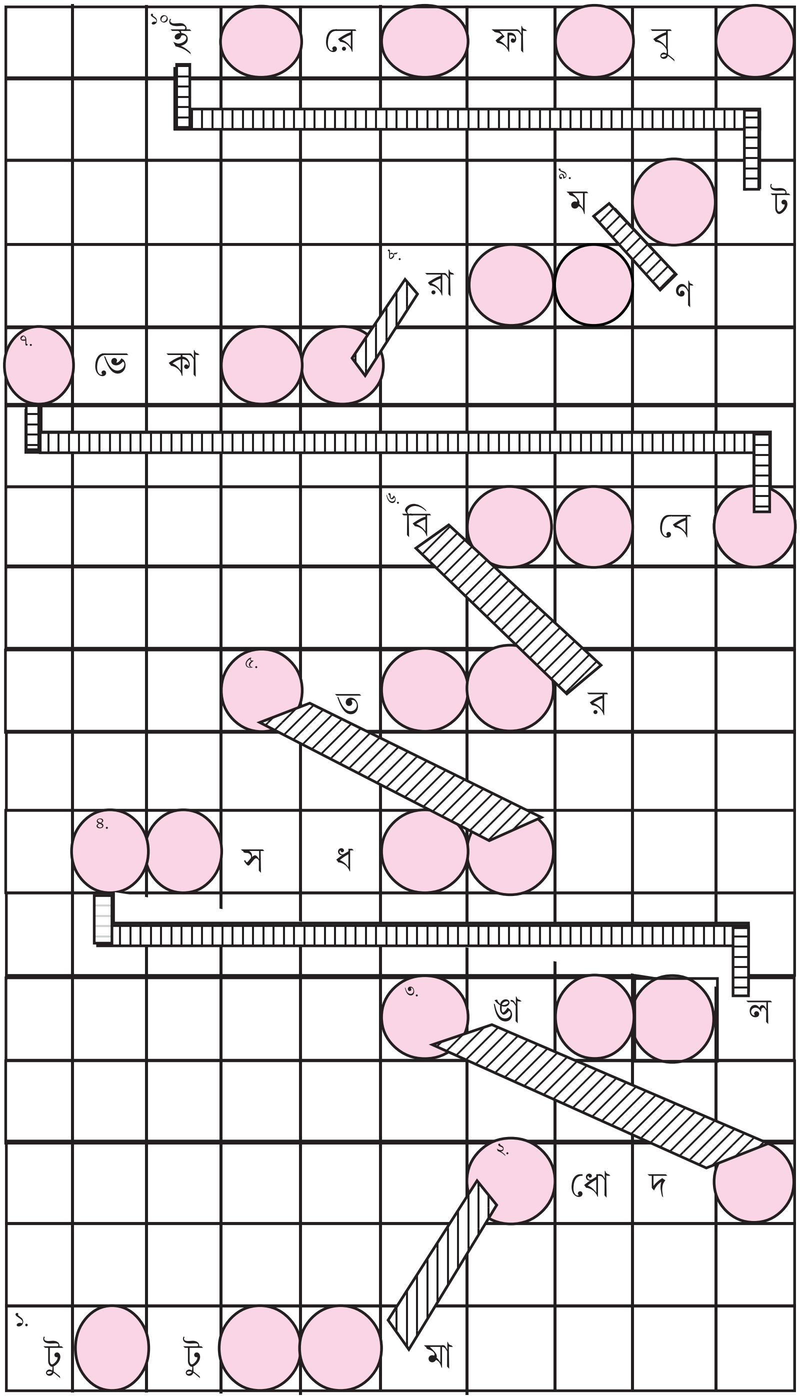

সূত্র:

১. পুতুলের গায়ে ছিল __________।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বই।

৩. বাক্সের মধ্যে শুয়েছিল __________।

৪. 'শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে __________ করতে লাগল।'

৫. হিংসুটির বয়স ছিল __________।

৬. '__________ মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন।'

৭. '__________ লাগল নাকি?'

৮. 'ছেলেদের __________।'

৯. '__________ ছিঁড়ে, কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল।'

১০. '__________ তার কবে শেষ হয়ে গেছে।'

সমাধান : ১. টুকটুকে জামা, ২. বোধোদয়, ৩. রাঙাপুতুল, ৪. ধড়াসধড়াস, ৫. সাত বছর, ৬. বিকেলবেলা, ৭. জিভে কামড়, ৮. রামায়ণ, ৯. মলাট, ১০. ইংরেজি ফার্স্টবুক।

১০. হিংসুটি আর হিংসে করে না। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে সে। তাকে সাহায্য করো দেখি, যাতে এবার সে পুতুলটাকে খুঁজে পায়।

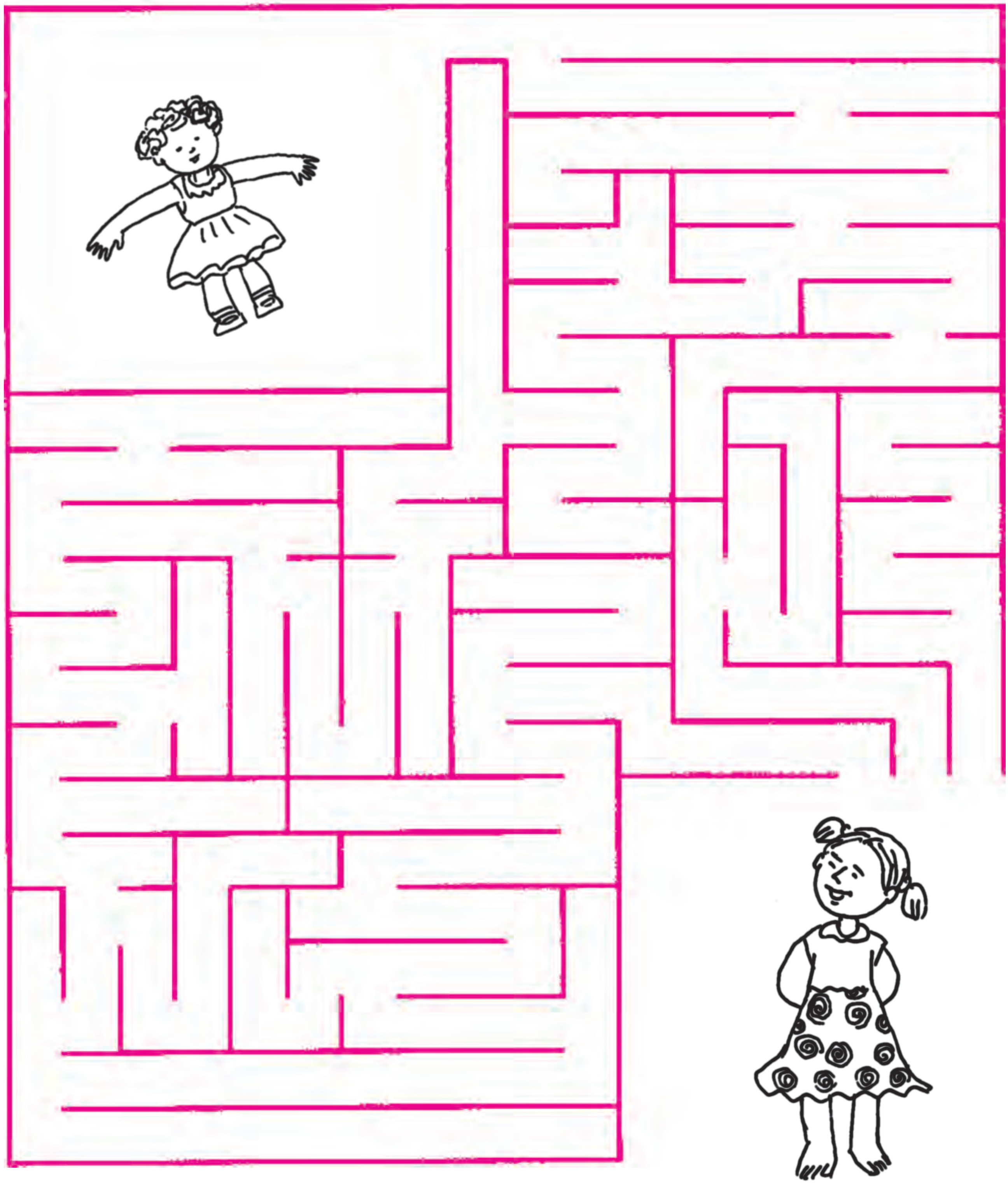

মনকেমনের গল্প

নবনীতা দেবসেন

এই বিষ্টি বিষ্টি দিনগুলো ভীষণ ভালো লাগে রুবাইয়ের। অন্ধকার মেঘলা করে আছে, সকাল থেকেই আকাশ আঁধার, তার ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে একটু একটু আলোর ছটা। আলো, কিন্তু রোদ নয়। বিষ্টি হব-হব, কিন্তু হচ্ছে না। গাছগুলো সব কান খাড়া করে রেডি হয়ে আছে বিষ্টির পায়ের শব্দ শুনবে বলে। রুবাইয়ের যে কী ভালো লাগে এরকম দিন। 'মেঘছায়ে সজলবায়ে' দিন এগুলো। এমন দিনে একটুও পড়ায় মন বসে না। তবু ইসকুলে তো যেতেই হয়। ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে চোখ ডানা মেলে কেবলই উড়ে যায় আকাশে। কেমন একটা উদাস উদাস ভাব চারিদিকেই। বাতাস বইছে অল্প অল্প। মা বললেন, 'দূরে কোথাও বিষ্টি পড়ছে,' কিন্তু এখানে আকাশটা কেমন ভারী ভারী, যেন বিষ্টি পড়ো-পড়ো হয়ে রয়েছে সারাটা দিন। মিষ্টি-মিষ্টি একটা ভাব চারিদিকে।

রাস্তার গাছেদের আজ বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। গরমকালের রোদ্দুরে এই গাছেদেরই কীরকম ধুলোভরা, ক্লান্তি, আর মনখারাপের মতন চেহারা হয়ে যায়। গাছেদেরও মেঘলা দিন পছন্দ, এমনি ছায়াভরা দিন পছন্দ। অথচ রোদ্দুর না উঠলে তো ওরা ক্লোরোফিল তৈরি করতে পারবে না। পাতাও সবুজ হবে না। কিন্তু সেটার জন্যে অত কড়া রোদ্দুর নিশ্চয় লাগে না। বোধ হয় ভোরের নরম আলোতেই গাছেরা সব জরুরি ক্লোরোফিল তৈরি করে নেয়।

এই ছায়াঘন, আলো-আঁধারির দিনে, দিনের বেলাতে আলো জ্বালাতে হয় ক্লাসের ঘরে। এমন দিনে কার ইচ্ছে করে ইসকুলে যেতে? কিন্তু 'মেঘলা দিনের ছুটি' বলে তো কিছু হয় না। আন্টিদেরও নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে না পড়াতে। তবুও কেন যে ইসকুল খোলা থাকে! আজ অবশ্য ছুটি। ইসকুলে গিয়ে যদি কেবল খেলার মাঠেই থাকা যেত। ছুটে বেড়ানো যেত মাঠের মধ্যে।

সেই যে গানটার সঙ্গে মা নাচ শিখিয়েছিলেন—'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি— আ-হা-হা হা হা—' সেটা ঠিক আজকের দিনের উলটো একটা দিনের গান। অনেকদিন বিষ্টিবাদলার পরে প্রথম যেদিন রোদের মুখ দেখা যায়, সেদিনটাও খুব আনন্দের। কিন্তু আনন্দের ধরনটা একই।

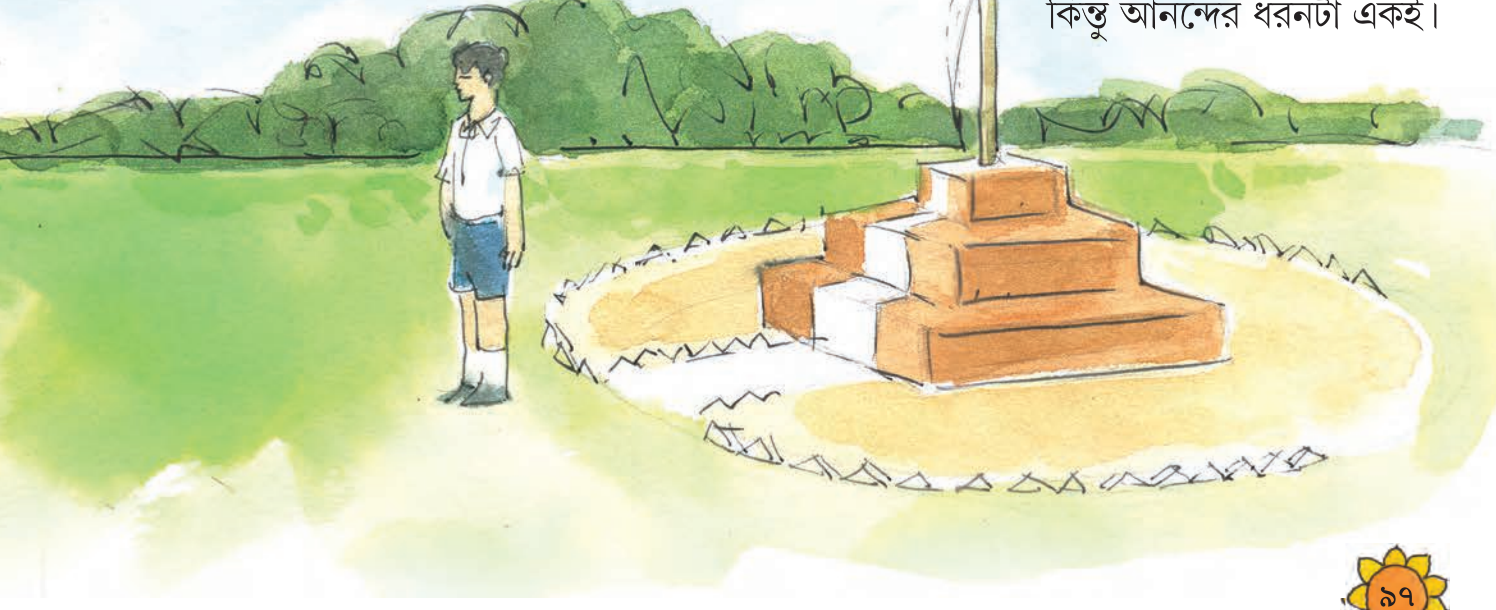

'কী করি আজ ভেবে না পাই/পথ হারিয়ে কোন বনে যাই/কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি— আ-হা-হা হা হা।'

কলকাতা শহরে তো বনজঙ্গল নেই যে 'পথ হারিয়ে কোন বনে যাই' মনে হবে। কিন্তু 'পথ হারিয়ে কোনখানে যাই' হতে পারে। অন্য কোথাও খুব যেতে ইচ্ছে করে এই সময়টাতে। চেনা জিনিসগুলো সব অচেনা দেখায়। গোটা পাড়াটাকে মনে হয় অন্য রাস্তা। অন্য দেশ। রুবাইয়ের ইচ্ছে করে সারাক্ষণ ছাদে দৌড়োদৌড়ি করতে। কিংবা বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতে, আকাশ দেখতে। কিংবা জানলায় চুপ করে বসে থাকতে। কী মিষ্টি একটা বাতাস দিচ্ছে! রুবাইয়ের ইচ্ছে করল ছোটোমামুর দেওয়া সুন্দর বাঁধানো খাতাটাতে কিছু লিখতে।

রুবাই লিখল—

'আজ ছুটি। আজ ১৫ই আগস্ট। ইসকুলে ফ্ল্যাগ তোলা হলো সকালে, তারপরেই ছুটি। সকালবেলাই ইসকুল থেকে ফিরে এসেছি। এমন ছায়াভরা আকাশে যখন ফ্ল্যাগটা উড়ল, আমরা 'জনগণমন'... গান গাইলাম। তখনই কী আশ্চর্য, বিরাট এক ঝাঁক ধবধবে সাদা পাখি ঠিক তক্ষুনি আকাশ দিয়ে, ফ্ল্যাগের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। অনেক দূর দেশ থেকে আসছে হয়তো। আরো অনেক দূরের দেশে যাচ্ছে। কী সুন্দর যে দেখিয়েছিল পাখির ঝাঁকটাকে আকাশে। সেই পতাকা ওড়ানোটাকেই যেন স্যালুট করে গেল ওরা। খুব সুন্দর কিচির-মিচির আওয়াজ করতে করতে উড়ে গেল ওই বলাকা, অত ওপর দিয়ে যাচ্ছে তবু শোনা গেল ওদের কাকলি-কূজন।'

পাখির কিচির-মিচিরকেই বলে 'কাকলি-কূজন'। আর ওই সাদা পাখির ঝাঁককেই বলে 'বলাকা'। রুবাই এইসব শব্দগুলো জানে। দিম্মা বলে দিতেন। এতটা লিখে রুবাই খাতা বন্ধ করে ফেলল। আজ সক্কলকার ছুটি। বাবার ছুটি, মার ছুটি, রুবাইয়েরও ছুটি। রুবাইয়ের ইসকুলের অবশ্য ছুটিই বা কী, খোলাই বা কী! ওদের তো কেবল খেলা আর গান, গান আর খেলা। আর টিফিন খাওয়া। এই তো ইসকুল রুবাইদের।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : বিষ্টি — বৃষ্টি । স্যালুট করা — অভিবাদন জানানো। আঁধার — অন্ধকার। কূজন — পাখির ডাক। মেঘছায়ে — মেঘের ছায়ায়। কাকলি — পাখির ডাক। সজল — জলপূর্ণ। বলাকা — সাদা পাখির ঝাঁক। ক্লোরোফিল — গাছের পাতার একটি উপাদান, যা থাকে বলে পাতার রং হয় সবুজ। জরুরি — দরকারি। ফ্ল্যাগ — পতাকা।

১. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

১.১ বৃষ্টির দিনগুলো বুবাইয়ের এত ভালো লাগে কেন?

১.২ আমাদের জাতীয় সংগীত কোনটি?

১.৩ ১৫ আগস্ট দেশ জুড়ে জাতীয় পতাকা তোলা হয় কেন?

১.৪ ইসকুল বুবাইয়ের কেমন লাগে?

১.৫ ‘বলাকা’ বলতে কী বোঝো?

১.৬ শক্ত শব্দের মানে বুবাইকে কে বলে দিতেন?

১.৭ বুবাইয়ের লেখার খাতা কে দিয়েছিলেন? খাতাটি কেমন?

১.৮ লেখার খাতায় বুবাই কোন দিনের কথা লিখেছিল?

১.৯ আমাদের দেশের জাতীয় পতাকায় কটি রং আছে? সেগুলি কী কী?

১.১০ বুবাই খাতায় যা লিখেছিল, তা তুমি নিজের ভাষায় লেখো।

নবনীতা দেবসেন (জন্ম ১৯৩৮) : কবি নরেন্দ্র দেব ও কবি রাধারাণী দেবীর কন্যা। কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ভ্রমণকাহিনি রচয়িতা। ‘প্রথম প্রত্যূষ, ‘স্বাগত দেবদূত’,‘আমি অনুপম’,‘করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে’ ইত্যাদি বিশিষ্ট রচনার রচয়িতা। কৌতুকপ্রবণতা এবং অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

২. **নির্দেশ অনুসারে লেখো :**

রুবাই বৃষ্টির দিনে যা যা করতে চায়	তুমি বৃষ্টির দিনে যা যা করতে চাও
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

৩. **এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

র চি মি চি কি র, ক ন কৃ লি কা জ, লো ধা আঁ রি আ, র ল ম গ কা, দ বৃ বা ষ্টি লা।

৪. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

বিষ্টি, ক্লোরোফিল, সারাক্ষণ, আশ্চর্য, সুন্দর।

৫. **বাক্য রচনা করো :**

অন্ধকার, রোদ্দুর, মেঘলা, বনজঙ্গল, সাদা।

৬. **'অল্প'— এই শব্দটিতে যেমন 'ল্প' আছে, এরকম তিনটি শব্দ লেখো যেখানে 'ল্প' রয়েছে।**

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৭.১ এই গল্পে 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' গানটির নাচ রুবাই শিখেছে। গানটি কার লেখা?

৭.২ বৃষ্টির সময় চারিদিকের পরিবেশ কেমন হয়ে যায় কয়েকটা বাক্যে লেখো।

৭.৩ তোমরা তোমাদের স্কুলে স্বাধীনতা দিবস কেমন করে পালন করো? কী কী অনুষ্ঠান হয়? সকলে মিলে তোমরা কোন গান গাও?

৭.৪ বৃষ্টির দিনে রাস্তার গাছেদের খুশি খুশি দেখায় কেন?

৭.৫ এমন একটা দিনের কথা লেখো যে দিন খুব বৃষ্টির জন্য তোমার স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৮. বৃষ্টি নিয়ে লেখা তোমার জানা কোনো ছড়া বা কবিতা লেখো।

দেশের মাটি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।
চন্দনেরি গন্ধে ভরা,-
শীতল করা, ক্লান্তি-হরা,
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি।
শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্-মহলের জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।
মউল ফুলের মাল্য মাথায়
লীলা কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোশে
অন্ন পানি জোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে
আটটি শিষে বাঁধা আঁটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখি,—
মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : শীতল — ঠান্ডা । নাগ — সাপ। ক্লান্তিহরা — যা ক্লান্তি দূর করে। মাল্য — মালা। খাঁটি — বিশুদ্ধ। কমল — পদ্মফুল। অঙ্গ — শরীর। পাঁয়জোর — নূপুর। শিয়র — মাথা। কনক — সোনা। নিদ্-মহল — ঘুমের প্রাসাদ। অন্নপানি — খাবার ও জল, এক কথায় খাদ্য। নিতি — নিত্য, রোজ। বার্তা — খবর।

১. **নীচের প্রশ্নগুলির দু-এক কথায় উত্তর দাও :**

১.১ তোমার দেশ কোনটি?

১.২ সেই দেশটি কেমন?

১.৩ দেশে থাকতে কবির কেমন লাগে?

১.৪ এই কবিতায় এমন একটি ফলের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে খাবার এবং জল— দুটোই থাকে। কোন ফল তা লেখো।

১.৫ ধানকে এখানে কনক বা সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

১.৬ কবিতায় কবি কোন পাহাড়ের কথা বলতে চেয়েছেন, যা আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখে?

২. কবিতাটি কার লেখা? এই কবির লেখা 'বাংলাদেশ' আর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সকল দেশের সেরা' কবিতা দুটি শিক্ষকের থেকে শুনে নাও।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ - ১৯২২) : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। 'ছন্দের যাদুকর' নামে বিখ্যাত। উল্লেখযোগ্য কবিতার বই - 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'অভ্র-আবীর' প্রভৃতি। নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধের বই লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন বহু কবির অজস্র কবিতা। সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য কোনো কোনো বিদেশি ভাষার ছন্দ বাংলায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা দেশের জীবন এবং গ্রাম আর প্রকৃতির নিবিড় পরিচয় তাঁর কবিতার জগৎকে গড়ে তুলেছে।

৩. ঠিক শব্দটির উপরে (√) চিহ্ন বসাও :

৩.১ মাথায় সূর্য এসে (সোনার/রূপার/তামার) কাঠি ছোঁয়ায়।
৩.২ (পাহাড়/ বন/সাগর) সে তার ধোয়ায় পা'টি।
৩.৩ দেশের কোল ভরে আছে (কনক/আমন/রঙিন) ধান।
৩.৪ গন্ধে মাতায় (লীলা/নীল/লাল) কমল।

৪. নীচে কতগুলি পঙ্‌ক্তি দেওয়া হলো যেগুলি পদ্যে লেখা। এগুলোকে গদ্য ভাষায় লেখো।

৪.১ 'পাহাড় তারে আড়াল করে, সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।'
৪.২ 'আমার দেশের পথের ধুলা খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।'
৪.৩ সে যে গো নীল পদ্ম আঁখি সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখি।'

৫. কবিতাটির প্রতিটি পঙ্‌ক্তির শেষে যে শব্দগুলি কবি ব্যবহার করেছেন, তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। এই মিলে যাওয়া শব্দগুলিকে খুঁজে বের করে লেখো :

(যেমন : মাটি এবং খাঁটি, ভরা ও হরা।)

৬. নীচে দেওয়া শব্দগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করো :

শব্দ	তোমাদের তৈরি শব্দ
নীল মনে যায় সোনা পানি	

৭. শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও:

ধোয়া	পাটি	খাটি
ধোঁয়া	পা'টি	খাঁটি

৮. যুক্তাক্ষর রয়েছে, এমন পাঁচটি শব্দ কবিতাটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

৯. কে কোন কাজটি করে লেখো : সূর্য, পাহাড়, সাগর, নাগ, বাঘ, নীলকণ্ঠ পাখি।

১০. নিজের ভাষায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

১০.১ কবিতাটিতে দেশের রূপবর্ণনায় কবি কোন কোন ফুলের নাম করেছেন?
১০.২ সেইসব ফুল দেশকে কীভাবে সাজিয়েছে?
১০.৩ দেশের প্রতি তোমার অনুভূতির কথা চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো।

কীসের থেকে কী যে হয়

প্রচলিত গল্প

অনেক দিন আগে এক সুন্দর বন ছিল। কত রকমের পাখি, কত জীবজন্তু। সবুজ গাছে-ঢাকা সেই বনের মধ্যে এদিকে-ওদিকে কয়েকটি গ্রাম। সে সব গ্রামে থাকে গৃহস্থ মানুষ। চাষ করে, ফলমূল জোগাড় করে, বনের মধু খেয়ে, কাঠ কেটে বড়ো সুখে তাদের দিন চলে যায়। বর্ষায় তিরতির করে যে বয়ে চলে পাহাড়ি নদী, সেই জলে কত ছোটো ছোটো মাছ। কোনো কিছুরই অভাব নেই।

সকালে কিছু খেয়ে কিশোরী মেয়েরা বনে কাঠ কাটতে যায়। ফিরে আসে দুপুরে। উনুন জ্বালাবার কাঠ। সবই শুকনো ডাল। কিছু শুকনো ডাল থাকে গাছে, কিছু পড়ে থাকে গাছের নীচে মাটিতে।

একদিন এক কিশোরী যেই গাছের শুকনো ডালে হাত রেখে শুকনো ডাল ভাঙতে যাবে, অমনি একটা কাঠপিঁপড়ে তার হাতে কামড়ে দিল। মেয়ে উঃ বলে সরে এল। বাঁ হাতে ছিল কাটারি, সেটা পড়ে গেল। কিশোরী ডান হাতটা ধরে বসে পড়ল।

কাটারিটা বাঁ হাত থেকে পড়ে নীচের একটা ঝোপে গিয়ে পড়ল। ঝোপে দৌড়োদৌড়ি করছিল ছোট্ট একটা কাঠবেড়ালি। কাটারি পড়ল তার লেজের ওপরে। ছোট্ট লেজ গেল কেটে।

ব্যথায় ছটফট করে কাঠবেড়ালি তরতর করে একটা অনেক উঁচু গাছে উঠে পড়ল। তার লেজ কেটেছে, তার খুব রাগ হয়েছে। সে তো কোনোদিন কারো কোনো ক্ষতি করেনি। সে আপন মনে থাকে, খেলে, লাফিয়ে বেড়ায়। বেজায় রেগে গিয়ে সে গাছের একটা বড়ো ফলে দাঁত বসাল। বোঁটা থেকে ফল ছিঁড়ে গেল। অনেক উঁচু থেকে সেটা নীচে গিয়ে পড়ল একটা হরিণের মাথায়। সে তখন মিষ্টি রোদে গাছের তলায় ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ মাথায় কিছু পড়ায় সে চমকে উঠল। অত উঁচু থেকে পড়েছে, তার মাথায়ও লেগেছে। আবার যদি কিছু পড়ে? সে ভয় পেয়ে তিরবেগে দৌড়ে পালাল।

ঝুরো মাটির মধ্যে ছোটো ছোটো পাখির বাসা। হরিণের ছুটে চলার পথে এরকম কিছু বাসা ছিল। পায়ের চাপে বাসাগুলো ভেঙে গেল।

পাখিরা ভয় পেয়ে এদিক ওদিক উড়তে লাগল। হায়! বাসার ছানারা বোধহয় মরে গেল। ডিমগুলো বোধহয় ভেঙে গেল। বনের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পাখিরা উড়ছে।

এক গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল এক হাতি। সে প্রকাণ্ড শুঁড় দিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে খাচ্ছে। কোনোদিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা ছোট্ট পাখি তার কানের ভেতর ঢুকে গেল।

হাতি লাফিয়ে উঠল। এ কী হল তার! কানের ভেতর ফরফর করছে। সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। কিন্তু ফরফর বন্ধ হচ্ছে না। ব্যথাও করছে। ভয় পেয়ে হাতি ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে সে এসে থামল এক চাষির ফসলের ক্ষেতে। সুন্দর ধান হয়েছে, সোনার রং ধরেছে। আর কয়েকদিন পরেই কাটতে হবে। হাতি সেই সোনালি ফসলের ক্ষেতে ঘুরপাক খেতে লাগল। তার বিশাল দেহ আর গোদা চার পায়ের চাপে ফসল নষ্ট হতে লাগল।

চাষি ছুটে এল। এ কী করছে হাতি! তার সব ফসল যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে খাবে কী! তার পরিবারের সবাই খাবে কী?

সে হাতির সামনে গিয়ে বলল, এ কী করছ হাতি? আমার সব ফসল যে নষ্ট করে দিলে। কোনোদিন কোনো হাতি এমন কাজ করেনি।

হাতি বলল, আমিও কোনোদিন ফসলের ক্ষেত নষ্ট করিনি। কিন্তু আমি যে আর পারছি না। আমি পাগল হয়ে যাব। আমার কানের মধ্যে যে একটা ছোট্ট পাখি ঢুকে রয়েছে। আমি কী করব? চাষি, আমার কোনো দোষ নেই। আমি সহ্য করতে পারছি না।

সে কথা শুনতে পেয়ে ছোট্ট পাখি বলল, আমারও কোনো দোষ নেই। আমি কোনোকালে হাতির কানে ঢুকিনি। কিন্তু কী করব? হরিণ আমাদের বাসা ভেঙে দিল। ভয়ে উড়ে পালাতে গিয়ে না দেখে হাতির কানে ঢুকে পড়েছি। আমার কোনো দোষ নেই।

হরিণ বলল, আমারও কোনো দোষ নেই। আমি কী করব? দুষ্টু কাঠবেড়ালি উঁচু গাছ থেকে একটা ফল আমার মাথায় ফেলে দিল। খুব ব্যথা পেলাম। ভাবলাম, আবার যদি ফল ফেলে দেয়! তাই ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করলাম। আমি তো নীচের দিকে তাকাইনি। পায়ের চাপে পাখির বাসা গেল ভেঙে। আমার কোনো দোষ নেই।

কাঠবেড়ালি বলল, আমার কোনো দোষ নেই। আমি ঝোপের মধ্যে খেলা করছিলাম। ওই মেয়েটার হাতের কাটারি আমার লেজে পড়ল। লেজ গেল কেটে। খুব ব্যথা পেলাম। রাগ হয়েছিল। তাই আমি উঁচু গাছের ফল ফেলে দিয়েছি। আমার কী দোষ!

কিশোরী বলল, আমার কোনো দোষ নেই। বাঁ হাতে কাটারি ধরে ডান হাত দিয়ে আমি গাছের একটা শুকনো ডাল ভাঙছিলাম। কাঠপিঁপড়ে আমার হাতে কামড়ে দিল। যন্ত্রণা হলো, বাঁ হাত থেকে কাটারি পড়ে গেল। আমি কী করব?

চাষি তখন বলল, সব নষ্টের গোড়ায় রয়েছে ওই কাঠপিঁপড়ে। এই কথা বলেই সে কাঠপিঁপড়েকে হাত দিয়ে চেপে ধরল। ধরে কিশোরীর হাতে দিল। বলল, ওকে শাস্তি দাও। বুঝিয়ে দাও ও কাজটা ভালো করেনি।

কিশোরী হাতের তালুর মধ্যে কাঠপিঁপড়েকে চেপে ধরল। হাঁটা দিল বাড়ির পথে। বাড়িতে এসে একটা সুতো দিয়ে কাঠপিঁপড়ের কোমর বাঁধল। তারপর তাকে ঝুলিয়ে রাখল একটা ছোটো গাছের সঙ্গে।

আর কোমরে সুতো বেঁধে কাঠপিঁপড়েকে ঝুলিয়ে রেখেছিল বলেই সেদিন থেকে কাঠপিঁপড়ের মাঝখানের পেটটা অমন সরু হয়ে গেল। কীসের থেকে কী যে হয়!

হাতে কলমে

শব্দার্থ : গৃহস্থ — গৃহে বাস করে যে। কিশোরী — অল্পবয়স্কা। কাটারি — দা। ক্ষতি — অপকার। তিরবেগে — তিরের মতো দ্রুত বেগে। প্রকাণ্ড — বড়ো। গোদা — মোটা এবং বড়ো। সোনালি — সোনার মতো রং যার। ঘুরপাক — গোল হয়ে ঘোরা। বেজায় — খুব। যন্ত্রণা — ব্যথা। শাস্তি — সাজা।

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ কিশোরী মেয়ে বনে কী করতে যায়?

১.২ কার লেজ কাটারির আঘাতে কেটে গিয়েছিল?

১.৩ কিশোরী মেয়ে কোন হাতে কাটারি ধরেছিল?

১.৪ ছোটো পাখি কার কানে ঢুকে পড়েছিল?

২. **তিন-চারটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ কিশোরী মেয়েরা কীসের জন্য বনে যেত?

২.২ কাঠবেড়ালি রেগে গিয়েছিল কেন? রেগে গিয়ে সে কী করেছিল?

২.৩ হরিণ ভয় পেয়েছিল কেন? ভয় পেয়ে সে পাখির কী ক্ষতি করেছিল?

২.৪ হাতি কেন চাষির ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে দিয়েছিল?

৩. **কোন প্রাণী কী খাবার খায় তা মিলিয়ে লেখো :**

কাঠবেড়ালি	কলাগাছ
পিঁপড়ে	ঘাস
হাতি	বাদাম
পাখি	চিনির দানা
হরিণ	পোকামাকড়

৪. কাদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে মিলিয়ে লেখো :

৪.১ কাঠপিঁপড়ে কিশোরী মেয়েটির (বাঁ হাতে / ডান হাতে) কামড়ে দিয়েছিল।

৪.২ হাতি (ধানের ক্ষেত / আখের ক্ষেত) নষ্ট করে দিয়েছিল।

৪.৩ হরিণের (পায়ের চাপে / শিঙের চাপে) পাখির বাসা ভেঙে গিয়েছিল।

৪.৪ কিশোরী মেয়েটি কাঠপিঁপড়ের (কোমরে / পায়ে) সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

৫. বাঁদিকের সঙ্গে ডান দিকের তালিকা মেলাও :

পাখির	শুঁড়
গাছের	তালু
ফসলের	বাসা
হাতির	ডাল
হাতের	ক্ষেত

৬. নীচে গল্পের ঘটনাগুলো এলোমেলো করে দেওয়া হলো। তোমরা ঘটনা অনুযায়ী পরপর সাজিয়ে লেখো:

৬.১ কাঠবেড়ালি রেগে উঁচু গাছের ফল হরিণের মাথায় ফেলে দিল।

৬.২ কাটারির আঘাতে কাঠবেড়ালির লেজ কেটে গেল।

৬.৩ হরিণের পায়ের চাপে পাখির বাসা ভেঙে গেল।

৬.৪ ছোটো পাখি ভয় পেয়ে হাতির কানে ঢুকে পড়ল।

৬.৫ কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে কিশোরী মেয়ের হাত থেকে কাটারি পড়ে গেল।

৬.৬ হাতির পায়ের চাপে ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেল।

৬.৬ হরিণ ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

৬.৭ হাতি কানের ব্যথায় পাগল হয়ে চাষির ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়ল।

৭. নীচে যে শব্দগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু বা কাজের নাম, নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ, মনের ভাব বা কাজকেই বোঝাচ্ছে। তোমরা সেগুলো আলাদা করে, নীচের তালিকাটি সম্পূর্ণ করো :

কাঠপিঁপড়ে, রাগ, কাটারি, সে সব, দৌড়, হাতি, লাফিয়ে উঠল, ভয়, সে, ঘুমোচ্ছিল, তার, ভেঙে দিল, ঝুলিয়ে রাখল।

ব্যক্তি / প্রাণী / বস্তুর নাম	নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ	মনের ভাব	কাজের নাম	কোনো কাজ

৮. **নীচে যে শব্দগুলি আছে তাদের অন্য অর্থ পাশের বাক্সের মধ্যে রয়েছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে শব্দের পাশে পাশে লেখো :**

মেয়ে	কাটারি
পাখি	ব্যথা
গ্রাম	চাষি
ডাল	বন

গাঁ, অরণ্য, পক্ষী, শাখা, দা, যন্ত্রণা, কৃষক, কন্যা

৯. **নীচে যে প্রাণীদের নাম দেওয়া আছে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লেখো :**

হরিণ, কাঠবেড়ালি, কাঠপিঁপড়ে, হাতি, পাখি।

১০. **নীচের ছকে ঠিক মতো √ বা × চিহ্ন দাও :**

বৈশিষ্ট্য	হাতি	পাখি	হরিণ	কাঠবেড়ালি
চারটি পা আছে	√	×	√	√
উড়তে পারে				
লেজ আছে				
ঘাস খায়				
পালক আছে				
শিং আছে				

১১. নীচের ছবিগুলির তলায় গল্প থেকে ঠিক বাক্য খুঁজে নিয়ে লিখে কাহিনিটি সম্পূর্ণ করো :

১১.১ ________________

১১.২ ________________

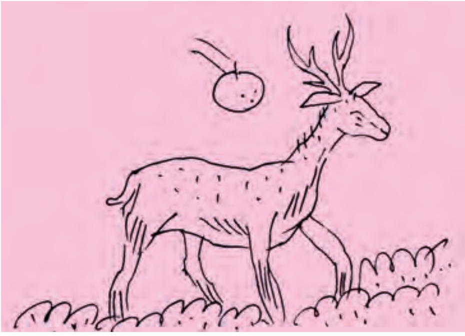

১১.৩ ________________

১১.৪ ________________

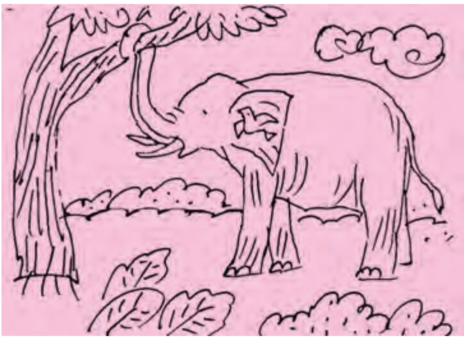

১১.৫ ________________

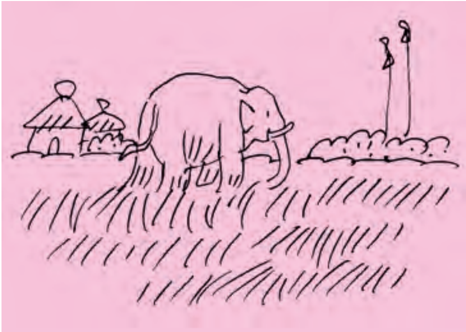

১১.৬ ________________

১১.৭ ________________

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

আগমনী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বর্ষা করে যাব, যাব,
শীত এখনও দূর,
এরই মধ্যে মিঠে কিন্তু
হয়েছে রোদ্দুর!

মেঘগুলো সব দূর আকাশে
পারছে না ঠিক বুঝতে,
ঝরবে, নাকি যাবে উড়ে
অন্য কোথাও খুঁজতে!

থেকে থেকে তাই কি শুনি
বুক-কাঁপানো ডাক?
হাঁকটা যতই হোক না জবর
মধ্যে ফাঁকির ফাঁক!

আকাশ বাতাস আনমনা আজ
শুনে এ কোন ধ্বনি,
চিরনতুন হয়েও অচিন
এ কার আগমনী।

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ শরৎ ঋতুর আগে কোন ঋতু আসে?

১.২ শরৎকালে বাঙালিদের কী কী উৎসব হয়?

২. **দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ শরৎকালে প্রকৃতির রূপ কেমন থাকে?

২.২ শরৎকালের মেঘ দেখতে কেমন হয়?

২.৩ শরৎকাল প্রসঙ্গে মনে পড়ে এমন দুটো সাদা জিনিসের নাম করো (একটা থাকে আকাশে, আর একটা মাঠে)।

৩. **বুঝতে-খুঁজতে, আকাশ-বাতাস— এই জোড়া শব্দগুলোর মধ্যে যেমন ছন্দের মিল আছে, তেমনভাবে ছন্দ মিলিয়ে নীচের তালিকাটি সাজাও :**

রোদ্দুর	ডাক
প্রাচীন	ভরসা
ধ্বনি	সমুদ্দুর
বর্ষা	অচিন
হাঁক	আগমনী

৪. **যে শব্দটি বেমানান তাতে গোল দাগ দাও :**

৪.১ শীত, বসন্ত, হেমন্ত, বৈশাখ, গ্রীষ্ম

৪.২ মেঘ, আগুন, বৃষ্টি, জল, বজ্রপাত

৪.৩ দুর্গা, কাশ, বরফ, শরৎ, নীল আকাশ

৫. **পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:**

শরৎ আমাদের সকলেরই খুব প্রিয় ঋতু। ভাদ্র ___ এই দুই মাস শরৎকাল। এই সময় আকাশ থেকে বর্ষার ___ মেঘ সরে যায় এবং ___ আকাশে ছড়িয়ে থাকে ___ রঙের ___ তুলোর মতো মেঘ। মাঠ ভরে থাকে ___ ফুলে। বাতাসে ভাসে ___ শব্দ। বাঙালির প্রাণের উৎসব ___ এবং ___ এই শরৎকালেই হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মেতে ওঠে উৎসবের ___ ।

সাদা, ঢাকের, আশ্বিন, নীল, কাশ, আনন্দে, তুলোয়, কালো, দুর্গা পুজো, ইদ, পেঁজা

৬. **নীচের সূত্রগুলি ব্যবহার করে শরৎকাল সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো:**

(নীল আকাশ—সাদা মেঘের ভেলা—কাশফুল—উৎসব—বেড়ানো—ছুটি—মজা)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) : রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবি, গল্পকার । ছোটোদের জন্য সৃষ্টি করেছেন 'ঘনাদা'। এছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি, রোমাঞ্চকর কাহিনি, গোয়েন্দা গল্প এইসব ধরনের রচনাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। ১৯২৬ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার কবি হিসাবে তাঁর প্রথম খ্যাতি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা', 'হরিণ-চিতা-চিল' ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি প্রচুর সার্থক ছোটোগল্প লিখেছেন।

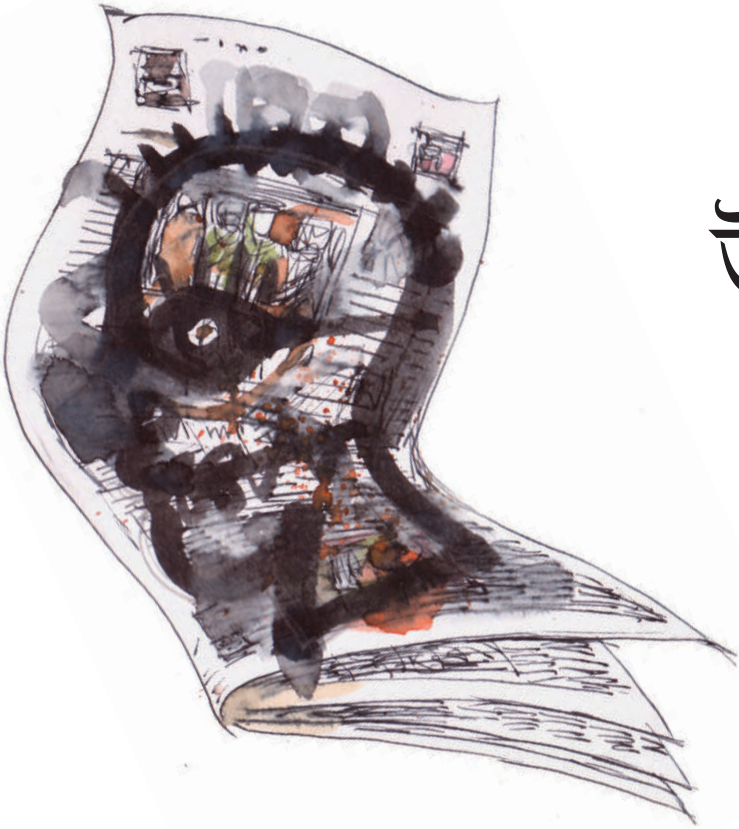

উড়ুক্কু ভূত

শৈলেন ঘোষ

সেদিন দুপুরবেলা ঝড় উঠেছিল—সাঁই-সাঁই-পাঁই-পাঁই করে। আর অমনি ঝড়ের ঝাপটায় বাগানে একটা ভূত ঢুকে পড়েছে। উরি বাবা—কী চেহারা ভূতটার। ড্যাবরা-ড্যাবরা চোখ, থ্যাবড়া-থ্যাবড়া নাক আর ফিনফিনে ফুরফুর। হাত নেই পা নেই, ধড়কাটা নড়া-ছটকানো ভূত। দাঁত ছরকুট্টে বাগানে ঢুকে হাওয়ায় ছুটছে।

প্রথম ভূতটাকে দেখতে পেয়েছিল কাক-ছানাটা। ঝড়ের সময় নিমগাছের বাসায় সে ঘাপটি মেরে বসেছিল। এমন সময় ভূতটা কোত্থেকে এসে একেবারে ওর ঘাড়ে। কাক বাছাধন ক্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ করে কেঁদে ওঠার আগেই ভূতটা তার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ফুড়ুত করে উড়ে একেবারে পেয়ারাগাছের ফোকরে। পেয়ারাগাছে একটা কাঠবিড়ালি, ডাল জড়িয়ে ঝড়ের হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল। ধড়কাটা ভূতটা যেই না কাঠবিড়ালিটার মুখের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, অমনি কাঠবিড়ালিটা ‘ও মাগো জলজ্যান্ত ভূত গো’—বলেই ডাল ছিটকে একেবারে অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপর লটকে পড়ল।

ঝড়ের তেজ বাড়ল, আবার ভূত ছুটল। পেয়ারাগাছ থেকে আমড়াগাছে। আমড়াগাছে মামদোবাজি লাগিয়ে দিলে। দিনের আলোয় হুতুমমুখো পেঁচাটা বাঁ-চোখের পর্দা ফেলে, ডান চোখটা খুলে ঝড়ের গুলতানবাজি দেখছিল। ফস করে ভূতটা তার মাথায় একটা টোক্কা মারতেই, 'কে র‍্যা?' বলে গম্ভীর চালে ধমকে উঠেছে। ধমকে উঠে যেই না বাঁ-চোখ খুলে ডান চোখ বুজেছে, আবার ডান চোখ বুজিয়ে বাঁ চোখ খুলেছে, ব্যাস অমনি সোনার-চাঁদের পিলে শুকিয়ে পাঁপড়ভাজা হয়ে গেছে। দু চোখ আর একসঙ্গে চাইতে হলো না। গলায় ঢোঁক গিলতে গিলতে কঁক করে দম আটকে বেচারা স্বর্গে গেলেন।

আবার ছুট। ঝড় ছোটে, ঝড়ের সঙ্গে ভূত ছোটে, ভূতকে দেখে ইঁদুর ছোটে, ইঁদুরকে দেখে ব্যাং ছোটে, ব্যাংকে দেখে ফড়িং ছোটে, ফড়িংকে দেখে চড়াই ছোটে, শালিক ছোটে। ছুটতে ছুটতে ভূতটা গিয়ে পড়ল বেগুন গাছের কাঁটায়। বেগুন গাছের কচিপাতায় দোল খেতে খেতে একটা গুটিপোকা কুট-কুট করে পাতা খাচ্ছিল। ভূতটাকে দেখে গ্রাহ্যি নেই! খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আপন মনে খাচ্ছে। ভূতটা কচিপাতার ওপর উড়ে বসল। গুটিপোকাটা অমনি সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বসল। মনে মনে গুটিপোকাটা বললে, 'ছাই, ভূত না আর কিছু।'

ওমা! অমনি ঝড় গেল থেমে। ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। আর সেই সৃষ্টিছাড়া ভূতটা জলের তোড়ে ব্যাস! ফ্যাঁস! ভূতের চেহারাটা জলের তোড়ে ভিজে—ফাঁক। ভূতের চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে দরদর করে বেরিয়ে এল জলে গোলা রং। রং ফুরোলে, মনে হলো কাকুর খবরের কাগজের যেন একটা ছেঁড়া পাতা। সেই ছেঁড়া পাতায় কে যেন ভূতের ছবি এঁকেছে! খবরের কাগজ মার্কা আচ্ছা গোলমেলে ভূত তো এটা!

শৈলেন ঘোষ (জন্ম ১৯২৮) : কৈশোরে ছোটোদের পত্রিকা 'মাস পয়লা'য় প্রথম কবিতা লেখা। 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' শিশু নাটকটি সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। তাঁর রচিত উপন্যাস- 'মিতুল নামে পুতুলটি' জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আমার নাম টায়রা', 'গল্পের মিনারে পাখি', 'ভূতের নাম আক্কুশ', 'টুই টুই' ইত্যাদি। এছাড়াও ছোটোদের জন্য অজস্র গল্প, ছড়া, নাটক রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন- 'হাসি ঝলমল মজা', 'স্বপ্ন দেখি রূপকথায়', 'ভালোবাসি পশুপাখি', 'গল্পের রং রকম রকম'।

শব্দার্থ : ধড় — দেহ। ফিনফিনে — পাতলা। দাঁত ছরকুট্টে — দাঁত বের করে। কোত্থেকে — কোথা থেকে। অজ্ঞান — অচেতন। গ্রাহ্যি — গ্রাহ্য, সমীহ।

হাতে কলমে

১. **এক কথায় উত্তর দাও :**

১.১ ভূতকে প্রথমে কে দেখতে পেয়েছিল?
১.২ কাকের ছানাটা কোন গাছের ডালে বসেছিল?
১.৩ আমড়াগাছে কে বসেছিল?
১.৪ কে কুট-কুট করে বেগুন গাছের কচি পাতা খাচ্ছিল?

২. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ ভূতের চেহারা কেমন ছিল?
২.২ ভূতকে দেখে হুতুমমুখো পেঁচার অবস্থা কেমন হয়েছিল?
২.৩ গুটিপোকা ভূতকে দেখে কী করেছিল আর মনে মনেই বা কী বলেছিল?
২.৪ বৃষ্টি নামার পর ভূতের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

২. **কে, কোন গাছে বসেছিল লেখো :**

২.১ গুটিপোকা ———— (লঙ্কা গাছ / বেগুন গাছ / জাম গাছ)
২.২ কাঠবেড়ালি ——— (পেয়ারা গাছ / লিচু গাছ / কলা গাছ)
২.৩ হুতুমমুখো পেঁচা——— (আমড়া গাছ / আম গাছ / কাঁঠাল গাছ)
২.৪ কাগের ছানা ——— (শিম গাছ / নিম গাছ / বেল গাছ)

৩. **কে, কোন কথাটা বলেছে মিলিয়ে লেখো :**

'ও মাগো জলজ্যান্ত ভূত গো'	প্যাঁচা
'কে র‍্যা?'	কাগছানা
ক্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ (কান্না)	গুটিপোকা
'ছাই, ভূত না আর কিছু'	কাঠবেড়ালি

৪. **শূন্যস্থান পূরণ করো : (পাশের ঝুড়িতে যে শব্দগুলো আছে তার সাহায্য নাও)।**

৪.১ হুতুমমুখো পেঁচাটা বাঁ চোখের ___ ফেলে ডান চোখ খুলে রেখেছিল ।
৪.২ কাঠবেড়ালি পেয়ারা গাছের ডাল জড়িয়ে ___ হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল।
৪.৩ ভূতটা আসলে কাকুর ___ কাগজের ছেঁড়া পাতায় আঁকা ছিল।
৪.৪ ভূতটা ___ গাছের কাঁটায় আটকে গেল।

বেগুন, খবরের, ঝড়ের, পর্দা

৫ কাকুর খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতায় আঁকা ভূতের ছবিটাই ঝড়ের ঝাপটায় উড়ে গিয়ে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তেমনিভাবে আর কী কী দেখে কীভাবে মানুষ অকারণে ভয় পেতে পারে, এ নিয়ে একটা ছোট্ট গল্প লেখো।

‘কীসের থেকে কী যে হয়’ আর ‘উড়ুক্কু ভূত’ মজার গল্প, ‘আগমনী’ আনন্দের কবিতা, উৎসবের কবিতা। এমনই আরেকটি ছোটো কবিতা তোমাদের জন্য রইল, পাশাপাশি পড়ার জন্য। কবিতায় রমেশের মতো তোমরাও কি মাঝে মাঝে একই কাজ করো?

মা ও ছেলে

রসময় লাহা

‘কুলুঙ্গিতে তিন জোড়া রেখেছি সন্দেশ,
এরই মধ্যে এক জোড়া কী হলো, রমেশ?’
‘এত অন্ধকার, মা গো, ওই কুলুঙ্গিতে
আরো যে দু জোড়া আছে পাইনি দেখিতে।’

রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯): প্রকাশিত কবিতার বই ‘পুষ্পাঞ্জলি’, ‘ছাইভস্ম’, ‘আরাম, আমোদ’, ‘পরিহাস’। ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ছাড়া অন্যান্য কবিতার বইগুলো বেশ মজার।

কে ছিলেন ঈশপ

ঈশপের নাম শোনেনি এমন মানুষ মনে হয় গোটা পৃথিবীতেই খুব বেশি নেই। তাঁর কোনো না কোনো গল্প তোমরাও নিশ্চয়ই এর মধ্যেই পড়ে বা শুনে ফেলেছ। সেই যে একটা শেয়াল কিছুতেই আঙুরগুচ্ছের নাগাল না পেয়ে শেষে 'আঙুরফল টক' বলে চলে গিয়েছিল। কিংবা ধরো, খরগোশ আর কচ্ছপের সেই গল্পটা, অহংকারী খরগোশ কচ্ছপের জেদ আর নিষ্ঠার কাছে দৌড় প্রতিযোগিতায় কেমন হেরে গিয়েছিল। অথবা, সেই যে একটা রাখাল ছেলে, মিছিমিছি 'বাঘ বাঘ' বলে চেঁচিয়ে যে লোক জড়ো করত, তারপর সত্যিই যখন একদিন তার ভেড়ার পালে বাঘ এসে পড়ল, তখন সেই ছেলেটার চিৎকার শুনেও কেউ বাঁচাতে এল না—এসব গল্প যে ঈশপেরই, তা তোমরা জানো।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন চমৎকার সমস্ত গল্প যাঁর রচনা, কে ছিলেন সেই মানুষটি? প্রাচীন গ্রিস দেশের এই মানুষটি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তাঁর চেহারা এমন কিছু আহামরি সুন্দর ছিল না, তা নিয়ে তাঁকে অনেক উপহাসও শুনতে হতো, তবে মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অতি জ্ঞানী। তাঁর আশপাশের সমস্ত লোকজনের আচার-ব্যবহার খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন তিনি, তারপর তাদেরই দোষ আর গুণ নিয়ে বানাতেন গল্প। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই এমন অনেক দোষ বা গুণ দেখা যায়, যা দেখে বিভিন্ন পশু-পাখির কথা মনে আসে। ইশপের এই সব গল্পের চরিত্রগুলিও তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ নয়, পশুপাখি। অবশ্য পশু-পক্ষীর কাহিনির ছদ্মবেশে মানুষের কথাই লিখেছেন ইশপ।

ইশপের প্রভু, রাজা ক্রোসাস একবার কিছু টাকা দিয়ে তাঁকে ডেলফিতে পাঠান। এই ডেলফি জায়গাটির পুরোহিতরা ছিল ভবিষ্যৎবাণীর জন্য বিখ্যাত কিন্তু তারা ছিল বড়ো লোভী। তারা যত টাকা পায়, ততই চায় আরো আরো টাকা। তাদের এই অর্থলোভ দেখে ইশপ বাঁধলেন একটি গল্প, আর সেই গল্পটি তিনি তাদের শুনিয়েও দিলেন। সেই যে একটা লোভী লোক, যার একটা সোনার ডিম-পাড়া হাঁস ছিল। সেই হাঁস রোজ একটা করে সোনার ডিম পাড়ত। লোকটা ভেবেছিল, যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে, তার পেটের মধ্যে নিশ্চয় অজস্র সোনার ডিম রয়েছে। সোনার লোভে একদিন লোভী লোকটা হাঁসের পেটটাই ফেলল কেটে। তাতে ফল হলো এই যে, রোজ তো সে একটা করে সোনার ডিম পেত, তাও আর তার পাওয়া হলো না। এইরকম অনেক-অনেক গল্প বানিয়েছিলেন ইশপ। সবই নীতিগল্প। অর্থাৎ সেগুলি পড়ে যে শুধু গল্পের মজা পাওয়া যায় তা নয়, সেই সঙ্গে পাওয়া যায় খুব ভালো ভালো সব উপদেশ। দয়া, মায়া, ভালোবাসা, সততা, কৃতজ্ঞতা, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি—এইসব সদ্‌গুণ যে আমাদের জীবনে কত জরুরি, তা আমাদের মনে করিয়ে দেন ইশপ।

ইশপের গল্পের অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে, প্রতি যুগের নিজস্ব ভাষায়। তাই সরাসরি অনুবাদ না করে অনেকেই গল্পগুলিকে নিজেদের দেশের আর সময়ের উপযোগী করে একটু বদলেও নিয়েছেন। কিন্তু গল্পগুলির মূল্য তাতে একটুও কমেনি। মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো শিক্ষকদের একজন এই মানুষটি— ইশপ।।

হাতে কলমে

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ শেয়াল কিছুতেই কীসের নাগাল পায়নি?

১.২ শেয়াল শেষে কী বলে চলে গিয়েছিল?

১.৩ খরগোশ কেমন ছিল?

১.৪ খরগোশ কার কাছে দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিল?

১.৫ খরগোশ কেন হেরে গিয়েছিল?

১.৬ রাখাল ছেলে কী করত?

১.৭ ইশপ কোন দেশের মানুষ ছিলেন?

১.৮ ইশপ কাদের নিয়ে গল্প বানাতেন?

১.৯ ইশপের প্রভু কে ছিলেন?

১.১০ তিনি ইশপকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন?

১.১১ সেই জায়গাটি কেন বিখ্যাত ছিল?

১.১২ সেখানকার মানুষ কেমন ছিল?

১.১৩ তাদের আচরণ দেখে ইশপ কোন গল্প বাঁধলেন?

১.১৪ নীতিগল্প কাকে বলে?

১.১৫ আমাদের জীবনে কোন গুণগুলি জরুরি?

১.১৬ অনুবাদ বা তরজমা কাকে বলে?

১.১৭ ইশপের গল্প বিভিন্ন দেশে কেন জনপ্রিয়?

১.১৮ ইশপকে কেন 'মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো শিক্ষকদের একজন' বলা হয়েছে?

শব্দার্থ : আঙুরগুচ্ছ — আঙুরের থোকা। নাগাল — ছোঁয়া। অহংকারী — দাম্ভিক, গর্বিত। জেদ — গোঁ, নাছোড়বান্দা ভাব। নিষ্ঠা — মনোযোগ, অনুরক্তি। ভেড়ার পাল — ভেড়ার দল। ক্রীতদাস — কেনা গোলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে — খুব মনোযোগ দিয়ে নজর করে। ছদ্মবেশ — আত্মগোপনের জন্য নেওয়া বেশ বা পোশাক। পুরোহিত — দেবতার পুজো করে যে। ভবিষ্যৎবাণী — ভবিষ্যতের কথা আগে বলে দেওয়া। নীতিগল্প — যে গল্প থেকে নীতিশিক্ষা পাওয়া যায়। উপদেশ — শিক্ষা, পরামর্শ, কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ। সততা — সাধুতা। কৃতজ্ঞতা — উপকারীর উপকার স্মরণ রাখা। সদ্‌গুণ — ভালো গুণ। অনুবাদ — তরজমা, অন্য ভাষায় পরিবর্তন।

২. **‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :**

ক	খ
শেয়াল	ভবিষ্যৎবাণী
রাখাল ছেলে	সোনার ডিম
ডেলফি	বাঘ
খরগোশ	আঙুরগুচ্ছ
হাঁস	দৌড় প্রতিযোগিতা

৩. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে নীচের শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ ইশপ ছিলেন একজন ______ (রাজা/ পুরোহিত/ক্রীতদাস)।

৩.২ ইশপের প্রভু ছিলেন রাজা ______ (ক্রোসাস/অলিম্পাস/জুলিয়াস)।

৩.৩ ইশপ ছিলেন ______ (চিন/গ্রিস/মিশর) দেশের লোক।

৩.৪ ইশপের প্রভু ইশপকে ______ (এথেন্স/স্পার্টা/ডেলফি) নগরে পাঠিয়েছিলেন।

৩.৫ ডেলফি শহরটি বিখ্যাত ছিল ______ (মসলিন কাপড়/ভবিষ্যৎবাণী/যুদ্ধবিগ্রহ)-এর জন্য।

৪. **নীচের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে ঠিক জায়গায় বসাও :**

অনুবাদ, উপহাস, নিষ্ঠা, নীতিগল্প, সোনার ডিম

৪.১ কচ্ছপের ছিল জেদ আর ______।

৪.২ একটা হাঁস ______ পাড়ত।

৪.৩ চেহারা নিয়ে ইশপকে ______ শুনতে হতো।

৪.৪ ইশপের রচনাগুলি ______।

৪.৫ ইশপের গল্পের ______ হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায়।

৫. **এই গদ্যে বলা নেই, তোমার জানা ইশপের এমন কোনো গল্প নিজের ভাষায় লেখো।**

৬. **ইশপের মতোই আমাদের দেশে ছিলেন বিষ্ণুশর্মা। তাঁর লেখা ‘পঞ্চতন্ত্র’ গোটা পৃথিবীতেই বিখ্যাত এবং সমাদৃত। ‘পঞ্চতন্ত্র’ থেকে কোনো গল্প জানা থাকলে সেটি শ্রেণিকক্ষে সবাইকে শোনাও। আর যদি জানা না থাকে, তবে শিক্ষিকা / শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নাও।**

৫. ইশপের অধিকাংশ গল্পের চরিত্ররাই বিভিন্ন জীবজন্তু, নীচের ছবিটি থেকে কটি প্রাণীর ছবি আর কটি অন্যান্য জিনিসের ছবি খুঁজে পাচ্ছ বলো। খুঁজে পাওয়ার পর পছন্দমতো আলাদা আলাদা রং দাও :

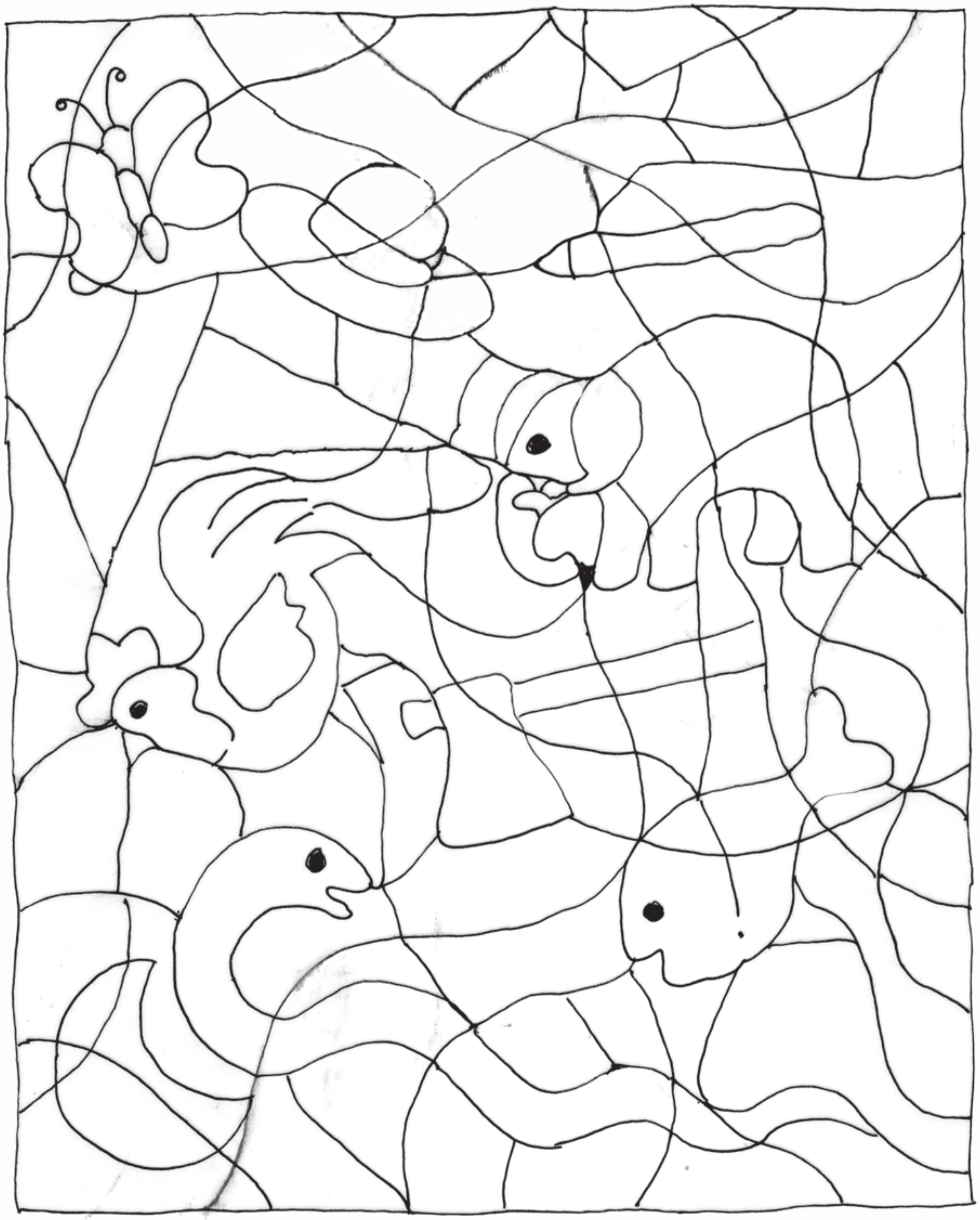

পানতাবুড়ি

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

গাঁয়েতে এক বুড়ি ছিল। তার মতো এমন গরিব কেউ কখনো দেখেনি। ভিক্ষা করে সে যে-কটি চাল পেত, ভাত রেঁধে চারটি রাতের বেলা খেত, বাকিগুলি পরদিন সকালের জন্য জল দিয়ে রাখত। সব দিন পানতাভাত খেত বলে, তার নাম ছিল পানতাবুড়ি।

একবার সেই গাঁয়ে এক চোর এসে উপস্থিত। বুড়ির পানতার সন্ধান পেয়ে সে রোজ রোজ তা খেতে লাগল। চোরের জ্বালায় বেচারি তো অস্থির।

একদিন বুড়ি রাজার কাছে নালিশ করতে চলল। যেতে যেতে পথে দেখল, একটা বেল পড়ে আছে। বেল জিজ্ঞাসা করল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ি। চোরে পানতা খেয়েছে, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।

বেল। ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা।

কিছু দূরে গিয়ে বুড়ি দেখল, একটা শিঙি মাছ।

মাছ বলল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ি। চোরে পানতা খেয়েছে, রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।

মাছ। ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা থাকো।

আর কিছু দূর গিয়ে বুড়ি একটি সূচ দেখতে পেল। সূচ বলল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ি। চোরে পানতা খেয়েছে, রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।

সূচ। ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা, বেশ!

আরও কিছু দূর গিয়ে বুড়ি দেখল, একখানা ছুরি পড়ে আছে। ছুরি জিজ্ঞাসা করল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

এতক্ষণ বুড়ি বেশ সহজভাবেই জবাব দিচ্ছিল, ক্রমে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। ছুরির কথার উত্তরে সে বিরক্ত হয়ে বলল, যেথায় যাই না, তোর তাতে কী?

ছুরি। রাগ করো কেন? একটা কথা শোনো—ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন হবে।

শেষে রাজবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে বুড়ি দেখল, পথের ধারে একটা কুমির পড়ে আছে। কুমির বলল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ির মেজাজ তখন আরও গরম। বলল, তোর কী? যেথায় খুশি যাচ্ছি! যমের বাড়ি যাচ্ছি, তুই যাবি?

কুমির। বাপরে বাপ—একেবারে যে আগুন! বলছি কী, ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। বেশ, দেখা যাবে।

এর পর বুড়ি যখন রাজবাড়িতে পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় শেষ হয়েছে। সেদিন রাজা গিয়েছিলেন শিকারে। কাজেই, বুড়ির আর নালিশ করা হলো না। ফিরবার পথে সে সেই কুমির, ছুরি, সূচ, শিঙি মাছ ও বেল নিয়ে এল।

শিঙি মাছ বলল, আমায় পানতার হাঁড়িতে রাখো।

বেল। আমায় আগুনের ভিতর রাখো।

সূচ। আমায় দেয়ালে পুঁতে রাখো।

ছুরি। আমায় উঠানের ঘাসে গুঁজে রাখো।

কুমির। আমায় ঘাটে বেঁধে রাখো।

যার যেমন ইচ্ছা, তাকে সেইভাবে রেখে বুড়ি রাত্রে ঘুমিয়েছে, এমন সময় চোর এসে উপস্থিত। সে যেই পানতার হাঁড়িতে হাত দিয়েছে, অমনি শিঙি মাছের কাঁটার এক খোঁচা! আগুন-তাপ দেবার জন্য যেই উনানের ধারে গেছে, অমনি বেল ফেটে চোখ অন্ধ। হাতড়াতে হাতড়াতে দরজার ধারে এসেছে, অমনি কাদায় পা পিছলে দড়াম! আহা, বেচারার আর শাস্তির শেষ নেই। দেয়াল ধরে উঠতে যাবে, অমনি সূচ বিঁধে রক্তারক্তি! উঠান দিয়ে পালাবে, অমনি ছুরিতে পা কেটে খানখান! ঘাটে নেমে হাত-পা ধোবে, অমনি একেবারে কুমিরের মুখে।

কুমির চিৎকার করে উঠল—

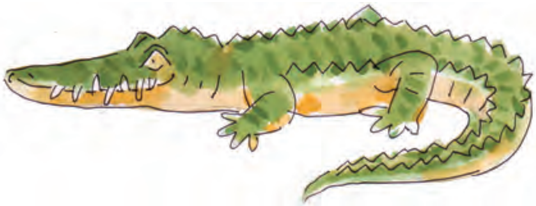

ও বুড়ি, তোর চোর ধরেছি।
ও বুড়ি, তোর চোর ধরেছি।

কুমিরের চিৎকার—বাপ রে সে কী ভয়ানক! বাঘের ডাক লাগে কোথায়! বুড়ি তো ধড়ফড় করে উঠে বসল। তারপর লোকজন ডেকে, চোরকে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করল। রাজা তাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, সে আর কী বলব!

১. **এক কথায় উত্তর দাও :**

১.১ পানতাবুড়ির নাম অমন হলো কেন?

১.২ পানতাবুড়ির দিন চলত কেমন করে?

১.৩ পানতাবুড়ি কার জ্বালায় অস্থির?

১.৪ অস্থির হয়ে পানতাবুড়ি কী করতে চলল?

১.৫ রাস্তায় প্রথমে তার সঙ্গে কার দেখা হলো?

১.৬ কিছুটা দূরে গিয়ে পানতাবুড়ির সঙ্গে কার দেখা হলো?

১.৭ সূচ বুড়িকে কী বলেছিল?

১.৮ ক্রমে বুড়ির মাথা গরম হয়ে উঠল কেন?

১.৯ বিরক্ত হয়ে বুড়ি কাকে কী বলেছিল?

১.১০ রাজবাড়ির কাছে গিয়ে বুড়ি কী দেখল?

১.১১ বুড়ি রাজবাড়িতে কখন পৌঁছল?

১.১২ বুড়ির আর নালিশ করা হলো না কেন?

১.১৩ ফিরবার পথে সে কী কী নিয়ে এল?

১.১৪ শিঙি মাছ কী বলল?

১.১৫ পানতা শব্দটির অর্থ লেখো।

১.১৬ বেল কী বলল?

১.১৭ সূচ কে কোথায় রাখা হলো?

১.১৮ ছুরি কোথায় গোঁজা ছিল?

১.১৯ কুমির কোথায় ছিল?

১.২০ কাকে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করানো হলো?

শব্দার্থ : গাঁ — গ্রাম। ভিক্ষা — চেয়ে চিন্তে দিন কাটানো। পানতাভাত — জল দেওয়া ভাত। শিঙি মাছ — একধরনের জিওল মাছ। সূচ — সেলাইয়ের উপকরণ। ঘাট — পুকুরে নামার সিঁড়ি। যমের বাড়ি — মৃত্যুপুরী। মেজাজ — মনের অবস্থা।

২. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ একবার গাঁয়ে এক ______ (চোর / ডাকাত / সন্ন্যাসী) এসে হাজির হলো।

২.২ বুড়ি বলল চোর তার ______ (পানতা / পায়েস / পিঠে) খেয়েছে।

২.৩ কিছু দূর গিয়ে বুড়ি দেখল, একটা ______ (শিঙি মাছ / রুই মাছ / কাতলা মাছ)।

২.৪ সেদিন রাজা গিয়েছিল ______ (শিকারে / বেড়াতে / যুদ্ধে)।

২.৫ ______ (কুমির / সূচ/ শিঙি মাছ) চিৎকার করে বলল, ও বুড়ি তোর চোর ধরেছি।

৩. ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
বুড়ি	গরম
শিঙি মাছ	উনান
বেল	ঘাট
মেজাজ	পানতাভাত
কুমির	পানতার হাঁড়ি

৪. নীচের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :

৪.১ তারপর লোকজন ______কে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করল।

৪.২ ______ বলল, আমাকে উঠোনের ঘাসে গুঁজে রাখো।

৪.৩ অমনি ______ বিঁধে রক্তারক্তি।

৪.৪ বুড়ির মেজাজ তখনও ______ ।

৪.৫ বুড়ি রাজার বাড়িতে ______ করতে চলল।

চোর , ছুরি, সূচ, গরম, নালিশ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬ - ১৯৩৭) : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিশুসাহিত্যিক। ‘হাসিখুশি’ রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। ‘বিকাশ’ ও ‘দীপ্তি’ নামে দুটি কাব্য লিখেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য বই - ‘ছবি ও গল্প’, ‘খেলার সাথী’, ‘বন্দেমাতরম’, ‘বনে জঙ্গলে’, ‘ছোটদের চিড়িয়াখানা’, ‘গল্পসঞ্চয়’ প্রভৃতি।

ঘুমিয়ো নাকো আর

বিমল চন্দ্র ঘোষ

রূপকথাটি জড়িয়ে বুকে খোকন ঘুমে মগ্ন
স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন!
আসছে যাচ্ছে কল্পলোকের হরেক রকম মানুষ
কেউ মাটিতে হেঁটেই চলে কেউ বা চড়ে ফানুস,
কারুর চোখে চশমা আঁটা, কারুর মুখে দাড়ি,
হাসলে কারও বেরিয়ে পড়ে ফোকলা দাঁতের মাড়ি!
একটু পরেই সব চুপচাপ কেউ কোথাও নেই,
স্বপ্নবুড়ি চরকা থামায় হারায় সুতোর খেই;
চাঁদের আলোয় দিগন্তহীন তেপান্তরের মাঠ,
জনমানুষের নেইকো দেখা বিষণ্ণ পথঘাট।
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিঁঝির ঝিঁঝির ঝিল্লিরা সব ডাকে,
নিঝুম রাতে হুতুম চেঁচায় হঠাৎ অশথ-শাখে।
স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন!
রূপকথাটি আঁকড়ে বুকে খোকন ঘুমে মগ্ন।

জানলা দিয়ে মুখটি বাড়ায় রাজপুত্রের ঘোড়া
মুক্তা গাঁথা ঝালর মাথায় হিরের লাগাম মোড়া,
ডাগর চোখে বলছে, 'খোকা ঘুমিয়ো নাকো আর,
পিঠের ওপর বসিয়ে তোমায় ছুটব সাগর-পার,
কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড় পেরিয়ে অচিন দেশে
রূপকুমারীর রাজ্যে তোমায় পৌঁছে দেব শেষে।'
স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন!
থমথমে রূপকথার দেশে খোকন ঘুমে মগ্ন।

হাতে কলমে

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ কে বুকে রূপকথা জড়িয়ে ঘুমে মগ্ন?

১.২ ‘কল্পলোক’ মানে কী?

১.৩ কল্পলোকের মানুষদের বর্ণনা দাও।

১.৪ কে চরকা কাটে?

১.৫ দিগন্তহীন মাঠটির নাম কী?

১.৬ ঝিল্লিরা কীভাবে ডাকে?

১.৭ নিঝুমরাতে অশথ-শাখে কে চেঁচায়?

১.৮ জানলা দিয়ে কে মুখ বাড়ায়?

১.৯ তার সাজ-পোশাক কী রকম?

১.১০ কে, কাকে পিঠের উপর বসিয়ে কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

১.১১ কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড় পেরিয়ে কোন দেশ?

১.১২ সেখানে কে থাকে?

শব্দার্থ : মগ্ন — ডুবে আছে যে, তলিয়ে গেছে যে। কল্পলোক — কল্পনার পৃথিবী। ফানুস — কাগজের তৈরি বেলুন, যা তপ্ত ধোঁয়া বা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে ওড়ানো হয়। ফোকলা — যার দাঁত নেই, দন্তহীন। চরকা — সুতো কাটার যন্ত্র। খেই — প্রান্ত, শেষ। দিগন্ত — আকাশ ও পৃথিবীর মিলনস্থল, দিকচক্রবাল। দিগন্তহীন — বিস্তীর্ণ, বিশাল। তেপান্তরের মাঠ — রূপকথায় বর্ণিত বিরাট মাঠ। বিষণ্ণ — বিষাদগ্রস্ত, দুঃখী। ঝিল্লি — ঝিঁঝি। নিঝুম — নিঃশব্দ। হুতুম — পেঁচা। অশথ-শাখে — অশ্বত্থ গাছের ডালে। ঝালর — কাপড়ের তৈরি জিনিসের কারুকার্যময় ও কোঁচকানো প্রান্তভাগ। লাগাম — ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে বাঁধা দড়ি, রশি। ডাগর — বড়ো বড়ো। কড়ি — একরকম সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ, আগে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অচিন — অচেনা, অজানা।

২. **শব্দঝুড়ি থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :**

২.১ কারুর চোখে _____ আঁটা, কারুর মুখে দাড়ি।

২.২ স্বপ্নবুড়ি _____ থামায় হারায় সুতোর খেই।

২.৩ নিঝুম রাতে _____ চেঁচায় হঠাৎ অশথ-শাখে।

২.৪ মুক্তা গাঁথা _____ মাথায় হিরের লাগাম মোড়া।

২.৫ থমথমে রূপকথার দেশে _____ ঘুমে মগ্ন।

হুতুম, খোকন, চশমা, ঝালর, চরকা

৩. **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :**

ক	খ
তেপান্তর	পাহাড়
কড়ি	দেশ
চোখ	শাখা
অশথ	মাঠ
অচিন	চশমা

৪. **এই কবিতায় যে সমস্ত শব্দজোড়ে ছন্দের মিল আছে তার মতো অন্তত পাঁচটি জোড়া খুঁজে লেখো (একটি করে দেওয়া হলো) :**

মানুষ
ফানুস

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০ - ১৯৮১) : বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার। তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জীবন ও রাত্রি', 'সাবিত্রী', 'উদাত্ত ভারত'। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা', 'শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা'র মতো বিখ্যাত গান তিনি রচনা করেছেন।

৫. তুমি কি রূপকথার গল্প পছন্দ করো ? যদি পছন্দ করো তবে কেন পছন্দ করো, লেখো। কোনো রূপকথা কি তুমি শুনেছ? শুনলে কার কাছ থেকে শুনেছ?

৬. তুমি কি স্বপ্ন দেখো? তোমার শেষ দেখা স্বপ্নটির কথা লেখো।

৭. স্বপ্নে যদি তুমি কোনও অচিন দেশে পৌঁছে যাও তবে সেখানে কী কী তুমি দেখতে চাইবে আর কী কী দেখতে চাইবে না লেখো।

৮. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দ ছকটি পূরণ করো :

১.			২.		৩.		৪.				৫.
	৬.								৭.		
								৮.			
	৯.					১০.			১১.		
১২.			১৩.								১৪.
						১৫.					
		১৬.			১৭				১৮.		

পাশাপাশি

১. ঝিঁ ঝিঁ শব্দে কারা ডাকে?
৪. স্বপ্নবুড়ি কী চালায়?
৬. তেপান্তরের মাঠটি কেমন?
৭. হুতুম পেঁচা যখন ডাকে তখন রাতটি কেমন?
১০. অচিন দেশে কে থাকে?
১২. রাজপুত্রের ঘোড়া কোথায় যাবে?
১৫. টাকা-_____
১৬. সাগরপারের প্রথম পাহাড়টি কীসের?
১৭. যা গেঁথে ফেলা হয়েছে।
১৮. হিরের লাগাম মুক্তোর কী দিয়ে মোড়া?

উপর-নীচ

১. ঝিঁঝি-র ডাকে কেমন অবস্থা হয়?
২. কবিতায় কোন মাঠের কথা বলা হয়েছে?
৩. রূপকুমারীর রাজ্য কোন দেশে?
৪. কল্পলোকের কিছু মানুষের চোখে কী থাকে?
৫. অশথ-শাখে কে চেঁচায়?
৮. রাজপুত্র 'খোকা' হলে রাজকন্যা কী হবে?
৯. 'স্বপ্ন'-কে বলি 'স্বপন', 'মগ্ন'-কে বলি _____ ?
১০. খোকন বুকে কী জড়িয়ে ঘুমায়?
১১. ফোকলা দাঁতের _____
১৩. কড়ির _____, হাড়ের _____
১৪. রাজপুত্রের ঘোড়ার চোখটি কেমন?

সমাধান :

পাশাপাশি : ১. ঝিল্লি, ৪. চরকা, ৬. দিগন্তহীন, ৭. নিঝুম, ১০. রূপকুমারী, ১২. সাগরপার, ১৫. কড়ি, ১৬. হাড়, ১৭. গাঁথা, ১৮. ঝালর ।

উপর-নীচ : ১. ঝিম, ২. তেপান্তর, ৩. অচিন, ৪. চশমা, ৫. হুতুম, ৮. খুকু, ৯. মগন, ১০. রূপকথা, ১১. মাড়ি, ১৩. পাহাড়, ১৪. ডাগর ।

৯. খোকন রাজপুত্র হয়ে রাজকন্যা রূপকুমারীর প্রাসাদে যেতে চায়। পথে আছে তেপান্তরের মাঠ, হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়, রাক্ষস-খোক্কস, দত্যি-দানো— কত কী! খোকন আর তার পক্ষীরাজ ঘোড়াকে নিরাপদ পথে রূপকুমারীর কাছে পৌঁছে দিতে পারো কি না, দেখি।

ভাষাপাঠ - এক

ভাষার কথা

ক্লাসে ঢোকার সময় শুনলাম সুমিতা রত্নাকে বলল, 'গল্পের বইটা আজ এনেছিস?' আর উত্তরে রত্না বলল 'একটু বাকি আছে, কাল আনব।' আর ক্লাসে ঢোকার পরে দেখলাম দেবাশিসের হাতে বল। শেষ বেঞ্চি থেকে স্বপন কোনো কথা না বলে দেবাশিসের দিকে হাত নাড়ল আর দেবাশিস বলটা পকেটে চালান করে দিল, এ দুটো কিন্তু একই ব্যাপার।

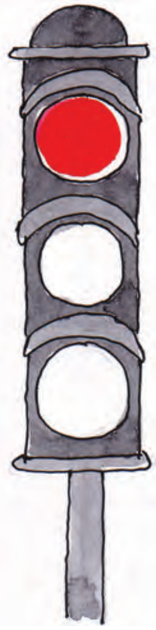

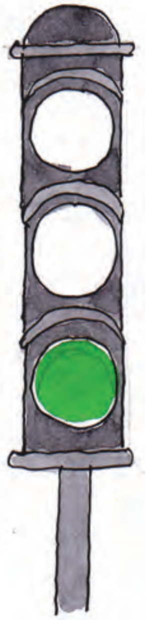

স্বপন অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো কথা বলিনি। রত্না আর সুমিতা কথা বলেছিল। তাহলে স্যার?

তাহলে তোমাদের দুটো গপ্পো বলি। তোমরা তো রেলগাড়িতে চড়েছ। অনেক সময় কেউ কোথাও নেই, চারদিকে ধু ধু মাঠ। কেউ বলেনি 'দাঁড়াও' কিন্তু রেলগাড়ি থেমে যায়। কেন?

সবাই হই হই করে বলল, সিগন্যালে লাল আলো জ্বলে বলে। সবুজ আলো জ্বললেই আবার ট্রেন চলতে থাকে।

বেশ। তাহলে কৌশিকের কথা বলি। ও আজ একটু চুপচাপ, একটু মনমরা। কেন জানো? কাল বিকেলে খেলার মাঠে কল্যাণকে কাটাতে না পেরে সবার চোখের আড়ালে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু কল্যাণ তো ওর বন্ধু। আজ সকাল থেকে কল্যাণ ওর সঙ্গে কথা বলছে না দেখে কৌশিক বুঝতে পেরেছে কল্যাণ অভিমান করেছে। কিন্তু কল্যাণ তো ওকে কিছু বলেনি। তাহলে কৌশিক কী করে বুঝল?

এবারও সবাই বলল, কল্যাণের হাবেভাবে।

তাহলে দেখো, সুমিতা-রত্নার কথা বলা, স্বপনের হাত নাড়া, সিগন্যালের লাল সবুজ আলো আর কল্যাণের হাবভাব — এ সবই আসলে কথা। ভাষা।

স্বপন আবার বলল, সুমিতা-রত্না কথা বলেছিল কিন্তু এ সবের ক্ষেত্রে কেউ তো কথা বলেনি।

বলেছিল। তুমি হাতের ইশারায় বলেছিলে, মাস্টারমশাই আসছেন। বলটা লুকিয়ে ফেল। সিগন্যালের লাল রং বলেছিল, যেও না সামনে বিপদ। আর সবুজ রং, বলেছিল বিপদ কেটে গেছে, এবার যাও। কল্যাণের হাবভাব বলেছিল 'শুধু শুধু আমায় মারলি, তুই আর আমার বন্ধু নোস'।

বলেছিল বলেই না দেবাশিস বলটা লুকিয়ে ফেলল, ট্রেন থামল, আবার চলতে শুরু করল আর কৌশিক মনমরা হয়ে আছে। আসলে মুখ দিয়ে শব্দ করে আমরা যে কথা বলি, সেটাই একমাত্র ভাষা নয়। অন্যান্য ভাবেও কথা বলা যায়। ভাষা হলো, যা বোঝা যায়, আবার অন্যকে বোঝানোও যায়।

এবার বলতে পারো কেমন করে বুঝল রত্না সুমিতার কথা বা সুমিতা রত্নার কথা? লাল আলো মানে যে থামতে হয় আর সবুজ আলো মানে যে যেতে হয় বা স্বপনের ইশারা — এ সব কীভাবে বোঝা গেল?

উত্তরটা সুমিতাই দিল, রত্না যে ভাষায় কথা বলেছিল সে-ভাষা আমরা জানি। লাল আলো মানে বা সবুজ আলোর মানেও সবাই জানে।

তার মানে প্রত্যেকটি ভাষার কিছু নিয়ম থাকে, সেই নিয়ম যারা জানে, তারা সেই ভাষা বুঝতে পারে। ভাষার নিয়ম নিয়েই আমরা কথা বলব। তবে এবার আমরা সেই ভাষা নিয়েই কথা বলব, যে ভাষা আমরা মুখে বলি। ইশারা বা হাবভাবের ভাষা নিয়ে নয়। আসলে ইশারার ভাষা বা হাবভাবের ভাষা দিয়ে বেশিক্ষণ কথা চালানো যায় না। অথচ মুখ দিয়ে কিছু আওয়াজ করে আর সেই আওয়াজগুলোকে জুড়ে নিয়ে সাজিয়ে আমরা অনর্গল কথা বলে যাই।

এই ম্যাজিকটা একমাত্র মানুষই আয়ত্ত করতে পেরেছে, অন্য প্রাণীরা পারেনি। এখন এই ম্যাজিকটা কিন্তু আসলে নিয়মের ম্যাজিক।

কৃশানু এমনিতে চুপচাপ, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করে, সকলকে অবাক করে দেয়, মনে হয় না যে ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র! সেই কৃশানুই প্রশ্ন করল, বাংলা ভাষা আমরা সবাই বুঝতে পারি, কথা

বলি। তার মানে তো নিয়মগুলি আমাদের জানা। জানা-না-হলে কী করে বুঝতাম আপনার কথা, বন্ধুদের কথা?

একদম ঠিক বলেছ তুমি। তোমরা সবাই এই নিয়মগুলি জানো। কবে জেনেছিলে তোমাদের মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। কিন্তু সেই জানা নিয়মগুলোকেই এবার স্পষ্ট করে আমরা জানব। শুনলে অবাক হবে এই পৃথিবীতে ছ-হাজারটা ভাষায় মানুষ কথা বলে। তুমি যেমন বাংলা বলো, তেমনি অনেকে বলে হিন্দি বা ইংরেজি, সোয়াহিলি...। তুমি যদি চাও বাংলা ছাড়া আরেকটা ভাষা শিখতে, তাহলেই প্রয়োজন হবে নিয়মগুলোকে স্পষ্ট করে শিখে রাখার।

ভাষা নিয়ে চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে, যে-কোনো ভাষার মধ্যেই এমন কিছু নিয়ম আছে, যা অন্যভাষার মধ্যেও থাকে। তাই তুমি যদি তোমার ভাষার নিয়মকে ভালো করে জানো, দেখবে সহজেই তুমি শিখে নিতে পারবে অন্য ভাষাও।

ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লিখলাম রত্না আর সুমিতার সকালের কথাগুলো : গল্পের বইটা আজ এনেছিস? একটু বাকি আছে। কাল আনব।

এই কথাগুলো রত্না আর সুমিতা বলেছিল। এরকম সারাদিনে তোমরা কত কথা বলো। কিন্তু আসলে কথার ছলে তোমরা কী বলো?

সবাই দেখলাম চুপ।

দেখো, তিনটি অংশ আছে ওদের কথায়। প্রতিটি অংশই মোটামুটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। অন্যের উপর নির্ভর করছে না। এই এক-একটা অংশ হলো 'বাক্য'। আমরা আসলে সারাদিনে কথার ছলে 'বাক্য' বলি।

কতগুলো বাক্য বলি একদিনে, সেটা একবার গুনে দেখো। চমকে যাবে কিন্তু ...

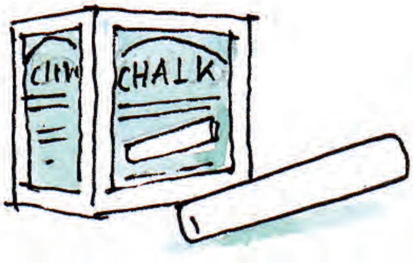

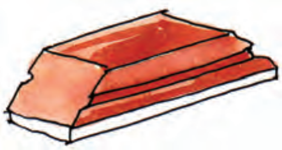

ভাষা পাঠ - দুই

বাক্যের কথা

তোমরা যে গ্রামে বা পাড়ায় থাক, সেই গ্রাম বা পাড়া গড়ে ওঠে কয়েকটা বাড়ি নিয়ে। আবার সেই বাড়ির ভিতর কী থাকে?

সবাই বলল, ঘর।

ঠিক, এক বা একাধিক ঘর। তবে সব ঘর একরকমের নয়। বাড়ির ভিতর কত রকমের ঘর থাকে?

এক-একজন এক-একটা ঘরের কথা বলতে লাগল।

কেউ বলল শোয়ার ঘর , কেউ বলল খাওয়ার ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, চানঘর — এই সব।

তাহলে নানারকম ঘর দিয়ে তৈরি হয় বাড়ি। আবার কয়েকটা বাড়ি নিয়ে তৈরি হয় পাড়া। এবার বলো তো, ভাষার নিয়ম নিয়ে কথা বলতে এসে পাড়ার কথা কেন বলছি? পাড়া বাড়ি ঘর এই সব মিলে যায় কীসের সঙ্গে?

আমাকে অবাক করে দিয়ে কয়েকজন বলে দিল, পাড়া হলো আসলে বাক্য। বাড়ি হলো শব্দ।

আর ঘর?

এইবার সকলে একটু বিপদে পড়েছে বলে মনে হলো। কেউ বলল ধ্বনি, কেউ বলল বর্ণ।

এখানে তোমাদের চুপি চুপি বলি, ধ্বনি আর বর্ণ কিন্তু এক নয়। ধ্বনি হলো আমরা যা উচ্চারণ করি আর বর্ণ হলো সেই ধ্বনির লিখিত চেহারা। সহজ করে বললে, আমরা যা দেখি তা হলো বর্ণ আর কানে যা শুনি তা হলো ধ্বনি। তাই কানে যে ধ্বনি শুনি বা মুখে বলি তার লিখিত রূপ বর্ণ। ধ্বনির সঙ্গে সবসময় যে বর্ণ মিলে যাবে, এরকম নাও হতে পারে। যেমন ধরো আমরা বলি ‘অ্যাখোন’, কিন্তু লিখি ‘এখন’।

আমাদের মুখে বলা অ্যা- ধ্বনি আর লিখিত এ-বর্ণ মেলে না। যদি বলি তোমাদের, বলো তো বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ কী কী?

সবাই বলল, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। বেশ। কিন্তু আমরা যখন কথা বলি তখন সেই কথার মধ্যে স্বরধ্বনির সংখ্যা কমে যায়। হয়ে যায় : অ আ ই উ এ ও অ্যা।

তাহলে স্যার ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ কোথায় গেল?

দেখো হ্রস্ব আর দীর্ঘ আলাদা করে উচ্চারণ আমরা করি না। আমাদের হ্রস্ব ই আর দীর্ঘ ঈ মিলে শুধু হ্রস্ব ই হয়ে যায়। একইভাবে উ আর ঊ মিলে শুধু উ হয়। ঋ আমাদের উচ্চারণে (র্ + ই =রি) হওয়ায় ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে যায়। আর আছে ঐ আর ঔ। বলো তো, ঐ আর ঔ ওর মধ্যে কী কী আছে।

প্রথমে একটু দমে গেলেও সবাই বারবার উচ্চারণ করে দেখালো যে, ঐ = ও + ই আর ঔ = ও + উ।

ঠিক। দুটো করে স্বরধ্বনি রয়ে গেছে ঐ আর ঔ -এর ভিতরে। দুটো আছে বলে এদের দ্বিস্বর বলে। আসলে ঠিক দুটো নয়, দেড়খানা। ও- র সঙ্গের ই আর ও- র সঙ্গে উ অর্ধস্বর। যাইহোক দুটো দ্বিস্বরের ধ্বনি আছে আমাদের বাংলায়, কিন্তু এরকম দ্বিস্বর আমরা অনেক বলি, অথচ তাদের কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ নেই। যেমন, ভাই (আই্), ঝাউ (আউ্), আয় (আএ্), নেই (এই্) ইত্যাদি। তাহলে বুঝতে পারছ স্বরবর্ণ বলতে যা তোমরা দেখেছ, তার সঙ্গে স্বরধনির কত তফাৎ!

যাই হোক , আমরা যে পাড়ার কথা বলছিলাম, সে-রকম ভাষার মধ্যেও এক-একটা পাড়া থাকে। যাকে আমরা বলেছি বাক্য। সেই বাক্য আবার তৈরি হয় শব্দ বা বাড়ি দিয়ে আর বাড়ির ভিতরের ঘরগুলো হলো বর্ণ।

তাহলে ‘আমি সকালে অঙ্ক করেছি’ —এই পাড়াটায় কটা বাড়ি আছে?

সবাই বলল, চারটে বাড়ি আছে।

বেশ। এবার বলো ‘আমি’ বাড়িটায় কটা ঘর আছে?

দুটো স্যার। ‘আ’ আর ‘মি’।

এইবার কিন্তু তোমরা ঠকে গেলে। একটা ঘর বেশি হবে। কীভাবে হবে ব্ল্যাকবোর্ডে করে দেখাচ্ছি :

আ + ম্ + ই। এই দেখো তিনটে ঘর। ম্-ঘরে ই-এর ঘর মিশে আছে। অনেক সময়ে তোমরা দেখবে কোনো কোনো বাড়িতে একটা বড়ো ঘর থাকে। যেমন এখানে আ। আর দুটো ঘর মিশে আরেকটা ঘরের মতো লাগে। ম্ আর ই সেই রকম দুটো ঘর।

তিনটে ঘর, কিন্তু তিনটে ঘরই আলাদা রকমের। তোমাদের এবার বলি ঘর কতরকমের হতে পারে!

ঘর দুধরনের হতে পারে। এমন ঘর যারা বেশ বড়ো, আবার অন্য ঘরের সঙ্গে মিশে সেই ঘরটাকে তৈরি করে। যেমন একটু আগে তোমরা দেখলে ই কেমনভাবে ম্-এর সঙ্গে মিশে মি তৈরি করে। ভাষার ক্ষেত্রে আমরা এদের স্বরধ্বনি বলি। তোমরা বলতে পারবে কেন স্বরধ্বনির

ঘরগুলো একা থাকে বা অন্য ঘরের জন্য দরকার হয়?

আমরা পড়েছি যে স্বরধ্বনি নিজে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে, তাই এরকম বলা যেতে পারে ।

বেশ, কিন্তু তোমাদের মনে হয়নি যে নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে, মানে আসলে কী? আমি বলে দিচ্ছি। বলো অ। বলো আ বা উ বা এ। মুখের ভিতর থেকে যে হাওয়াটা বেরিয়ে আসছে সেখানে কেউ বাধা দিচ্ছে না। জিভ উঠে গিয়ে একবারও পথ বন্ধ করছে না। ঠোঁট দুটোও চট করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। শুধু মুখের ভিতরটা কখনো পুরো খোলা থাকছে, কখনো সরু হয়ে যাচ্ছে...এই জন্য বলা হয় স্বরধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত হয়। এটা একরকমের ঘর। আরেক রকমের ঘর হলো ব্যঞ্জনধ্বনি। কাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি?

যে ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না, স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়...

এইবার তোমরাই বলো এর মানে আসলে কী?

সবাই একটু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিল। মুখের মধ্যে জিভ দিয়ে নানারকম আওয়াজ করল। তারপর বলল, এইবার মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা হাওয়া কেউ না কেউ আটকে দিচ্ছে। জিভ নানা সময়ে নানা জায়গায় পথ আটকাচ্ছে। পথ আটকাচ্ছে ঠোঁটও। তবে একটুখানি সময়ের জন্য, আর তার ফলেই ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি হচ্ছে।

অনেকটা ঠিক। সবটা নয়। তোমরা যা বলেছিলে তার শেষ কথাটা কিন্তু এখনও বোঝা গেল না। তোমরা বলেছিলে, স্বরধ্বনির সাহায্য লাগে ব্যঞ্জনধ্বনি বলার ক্ষেত্রে। কেমন এই সাহায্য? আমিই বলছি।

দেখো। প্রথমে ঠোঁটদুটো দিয়ে আটকাও হাওয়ার পথ এবং সেই পথ ছেড়ে দাও অ বলতে চেয়ে। দেখো, প, ফ, ব, ভ বেরোলো। আবার একই ভাবে আটকাও পথ। আ বলতে চেয়ে ছেড়ে দাও পথ। এইবার হলো পা, ফা, বা, ভা। একইভাবে আবার পথ আটকাও, ই বলতে চাও, দেখো হবে পি, ফি, বি, ভি। তাহলে বুঝতেই পারছ কীভাবে স্বরধ্বনি বয়ে নিয়ে এল ব্যঞ্জনধ্বনিকে।

আরেকভাবে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করা যায়। সে ক্ষেত্রেও স্বরধ্বনি লাগে। আগের ক্ষেত্রে হয়েছে পা (প্ + আ) বা পি (প্ + ই)। এবার আগেই বসাও স্বরধ্বনি তারপর ব্যঞ্জনধ্বনি। কী রকম হবে দেখো: আ + প্ = আপ বা ই + প্ = ইপ। এক্ষেত্রেও ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে স্বরধ্বনির সাহায্যে। কিন্তু শুধু প্ বা ব্ উচ্চারণ করতে পারবে না।

তাহলে ঘর তিন রকমের। স্বরধ্বনির ঘর, ব্যঞ্জনধ্বনির ঘর আর ব্যঞ্জনধ্বনির ঘরের লাগোয়া স্বরধ্বনির ঘর যেটা না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যেত না, যাকে আমরা স্বরচিহ্ন দিয়ে চিনি (একমাত্র অ ছাড়া)।

এইবার তাহলে দেখো তো, 'আমি সকালে অঙ্ক করেছি' পাড়াটার ঘরগুলো কেমন?

■ নীচে কয়েকটি বাক্য দেওয়া হলো। এই বাক্যগুলোর শব্দ কীভাবে তৈরি লেখো :

- আজ ছুটি।
- আজ পনেরোই আগস্ট।
- সকালবেলাই ইসকুল থেকে ফিরে এসেছি।
- ইসকুলে ফ্ল্যাগ তোলা হলো সকালে, তারপরেই ছুটি।
- তখনই কী আশ্চর্য, বিরাট এক ঝাঁক ধবধবে সাদা পাখি ঠিক তক্ষুনি আকাশ দিয়ে, ফ্ল্যাগের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।
- এমন ছায়াভরা আকাশে যখন ফ্ল্যাগটা উড়ল, আমরা 'জনগণমন' গান গাইলাম।

ভাষাপাঠ - তিন

বর্ণ আর ধ্বনির কথা

বাড়ির মধ্যে কটা ঘর আর কেমন সেই ঘর, ক্লাসের সবাই খুঁজতে লেগে গেল। আমি ভাবলাম জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখি। সকালের নরম আলোয় কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! যেই না ভাবা, অমনি দেবাশিস এসে হাজির 'সকাল' নিয়ে। মুখে, বিকেলের ছায়া। 'সকাল'-এর ভিতর কটা ঘর, বুঝতে পারছে না। ওর খাতার হিসেবে চারটে ঘর (স + ক্ + আ + ল)। দেবাশিসের লেখাটাই ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে সবাইকে বললাম, 'তোমাদের সব্বাইকার 'সকাল' কি দেবাশিসের মতো ?' সবাই দেখলাম বন্ধুর পাশেই দাঁড়াতে চাইছে।

আমার হিসেবে 'সকাল' -এর মধ্যে আরো একটা ঘর আছে। কেমন করে? এইভাবে 'স্ + অ + ক্ + আ + ল্' যেই লিখলাম, অমনি সবাই প্রতিবাদ করে বলল, স এর অ পেলাম কী করে!

আসলে প্রতিটি স্বরবর্ণের একটা করে স্বরচিহ্ন থাকলেও 'অ' এর কোনো আলাদা চিহ্ন নেই। আ-এর যেমন 'া', ই-এ যেমন ি, ঈ-এর ী। যেমন ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ, কিন্তু 'অ' এর কোনো চিহ্ন নেই, সে মিশে থাকে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে।

আমার কথাটা কৌশিকের খুব একটা পছন্দ হলো না : স্-এর অ মিশে থাকলে ল্-এর সঙ্গেও তো থাকবে? 'সকাল'-এর শেষে তো আমরা হসন্ত চিহ্ন দিই না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু আমরা যে ভাবে 'সকাল' বলি, সেইভাবে লিখলে ল্ -এর পর অ দিতে হয় না। কিন্তু যদি 'অঙ্ক' কে ভেঙে লিখি, তাহলে শেষে অ লিখতে হবে, অ + ঙ্ + ক্ + অ।

কৌশিক সহজে মেনে নিতে চায় না। আমিই তো বারবার বলেছি যে মনে কোনো খটকা রাখবে না, সবসময় প্রশ্ন করে ঠিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে। তাই কৌশিকের প্রশ্ন, আমরা তো অঙ্ক বলি না, বলি অঙ্কো, তাহলে তো শেষে অ হবে না, হবে ও।

আমি কৌশিককে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথ'-বাড়িটার ঘরগুলো কেমন একটু দেখো তো।

কৌশিক লিখল : র্ + অ + ব্ + ঈ + ন্ + দ্ + র্ + অ + ন্ + আ + থ্।

লেখার পর বলল, দুটো অ-কেই ও করে দেওয়া উচিত।

করলে না কেন?

ও চিহ্ন তো দেওয়া নেই, তাই করলাম না। কিন্তু আমরা তো রোবিন্দ্রোনাথ্-ই বলি!

এক কাজ করো : র্ + অ + ব্ -এর পর থেকে মুছে দাও। তাহলে কী হলো? রব। 'রব' মানে জানো তো? 'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল' কবিতাটি শুনেছ?

সবাই বলল হ্যাঁ।

তাহলে 'র্ + অ + ব্' কে কী বলো রোব্ না রব্?

এবার কল্যাণ বলল, আমরা তো রোববার বলি, রববার বলি না।

দেখে ভালো লাগল যে ভাষার যুদ্ধে কল্যাণ তার অভিমান ঝেড়ে ফেলে বন্ধুর পাশেই দাঁড়িয়েছে।

আসলে রোববার এসেছে রবিবার থেকে। রবিবার তো আমরা বলি না, বলি রোবিবার। সেখান

থেকে রোববার। এটা শুধু বাংলা ভাষায় হয়, এমন নয়। অন্যান্য ভাষাতেও এইরকম নানা উচ্চারণ আছে।

ইংরেজিতেই দেখো,

a-এর কত রকম উচ্চারণ:

cat-এ ক্যাট অর্থাৎ অ্যা
কিন্তু, art-এ আর্ট অর্থাৎ আ
আবার, ape-এ এপ অর্থাৎ এ
আবার, all-এ অল অর্থাৎ অ

e-এরও নানারকম:

egg — এগ অর্থাৎ এ
আবার, electric — ইলেকট্রিক অর্থাৎ ই

i-এর উচ্চারণেও এই ব্যাপারটা আছে,

ink — ইংক অর্থাৎ ই
আবার, ice cream — আইসক্রিম অর্থাৎ আই

u-এর ক্ষেত্রেও তাই,

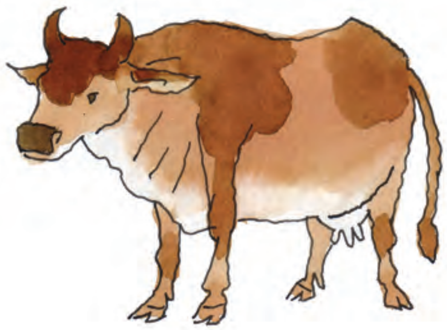

but — বাট অর্থাৎ আ
আবার, put — পুট অর্থাৎ উ
কিন্তু, tube — টিউব অর্থাৎ ইউ

o-এর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার,

ox — অক্স অর্থাৎ অ
only — ওনলি অর্থাৎ ও
one — ওয়ান অর্থাৎ ওয়া

ঠিক আছে, আমাদের ভাষায় এরকম আরো লিখে দিচ্ছি :

রস	কিন্তু	রসিক	(রোসিক)
রস	কিন্তু	রসিয়ে	(গল্পটা রোসিয়ে বলছে)
রচনা	কিন্তু	রচিত	(রোচিত)
রহমত	কিন্তু	রহিম	(রোহিম)
বক	কিন্তু	বকুনি	(বোকুনি)
		বকুল	(বোকুল)
বংশ	কিন্তু	বংশী	(বোংশী)

এখন বলো তো, নীচের শব্দগুলো কী কী বর্ণ দিয়ে তৈরি ?

- সৌম্য
- স্বাধীনতা
- কম্পিউটার
- দর্পণ
- শরৎচন্দ্র
- প্রণাম

ভাষাপাঠ - চার

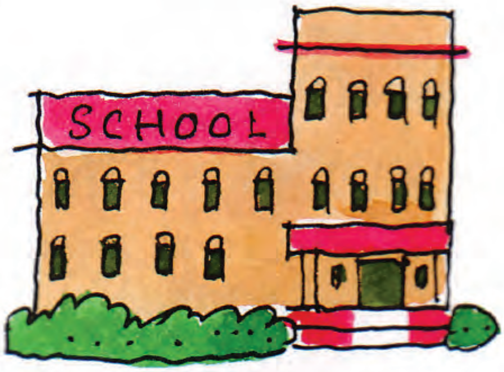

নিয়মের কথা

মেঘনার বাড়ির পিছনে একটা পুকুর ছিল। একদিন সেই পুকুর বুজিয়ে সেখানে বড়ো একটা বাড়ি তৈরি হলো। সেই থেকে খুব দুঃখ মেঘনার।

সেই দিন ক্লাসে ঢুকতেই মেঘনা অভিমানের গলায় বলে ফেলল, ভাষার পাড়ায় যে বাড়িগুলো থাকে, সেখানে কি কোনো নিয়ম আছে? যেখানে খুশি বাড়ি করা যায়?

নিশ্চয়ই আছে। নিয়ম না মানলে তো একের কথা অন্যে বুঝতেই পারবে না। আজ তোমাদের সেই নিয়মের কথাই বলব। তার আগে তোমরা বলো তো জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটা?

কিংশুক স্কুলে এসেই টিফিন খেয়ে নেয়। তাই শেষ বেঞ্চির কোণ থেকে বলল, খাওয়া।

সমস্ত ক্লাসে তখন সবাই হাসছে। আমি কিন্তু বললাম, কিংশুক একেবারে ভুল বলেনি। বরং অন্যরা কী বলবে বলো ?

কৌশিক বলল, লেখাপড়া করা।

তৌফিক বলল, অন্যকে সাহায্য করা।

রত্না বলল, বড়োদের কথা শোনা।

তোমরা সবাই কিংশুকের মতো একটু একটু ঠিক বলেছ। তোমাদের সবার কথা মিলিয়ে দিলেই ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। আমি তোমাদের সাহায্য করছি। তোমরা তোমাদের বইয়ের প্রথম পাঠের কথা মনে করো।

এইবার সবাই বলল, কাজ করা।

ঠিক। বাক্যের মধ্যে এই কাজ করা ব্যাপারটা থাকে। সবসময় যে খুব সরাসরি থাকে এমন নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হোক, উহ্য থেকে হোক, যেভাবে হোক, থাকে। কিংশুকের প্রিয় কাজটাকেই আমরা উদাহরণ হিসেবে নিই : খাওয়া।

এখন খাওয়া বললেই তো হবে না। কাজ তো নিজে নিজে হয় না। কাউকে করতে হয়। কেউ না করলে কাজ বোঝা যায় না। তাই বাক্যে প্রধান হলো যে, কাজটা কার। যদি প্রশ্ন করি 'কে খায়?', তখন উত্তর হবে 'কিংশুক খায়'। 'কিংশুক খায়' এই হলো একটা ছোট্ট ভাষার পাড়া। প্রথমে থাকবে 'কিংশুক' নামের বাড়ি, তারপর থাকবে 'খায়' বাড়ি।

কিন্তু তোমাদের তো মনে হতেই পারে 'কিংশুক কী খায়?' উত্তর হবে 'কিংশুক লুচি খায়।'এইবার এই নতুন পাড়ায় আরেকটা বাড়ি হল 'লুচি'। সে বাড়িটা হবে মাঝখানে।

ব্যপারটা এই রকম :

কিংশুক	খায়	
কিংশুক	ভাত খায়	(কী খায়?)
কিংশুক	হাত দিয়ে ভাত খায়	(কীভাবে খায়?)
কিংশুক	হাত দিয়ে মাছের ঝোল আর ভাত খায়	(কী দিয়ে ভাত খায়?)

এইভাবে পাড়ায় নতুন নতুন বাড়ি হতেই পারে কিন্তু প্রথম আর শেষ বাড়িটা একই থাকে।

এই নিয়মেও মেঘনা খুশি হয় না। তাহলে মাঝখানে যে নতুন বাড়ি হবে, সেখানে কি আর কোনো নিয়ম থাকবে না, যে-যার খুশি-মতো বাড়ি করবে?

নিশ্চয়ই নিয়ম থাকবে সেখানে। নতুন যে বাড়ি করবে, দেখতে হবে এই পাড়ায় কার সূত্রে সে আসছে। যেমন 'মাছের ঝোল' এসেছে ভাতের সূত্রে। তাই সেই বাড়িটা ভাতের পাশে। সেক্ষেত্রে ভাতের যে-কোনো দিকে সে থাকতে পারে। 'মাছের ঝোল আর ভাত' হতে পারে। আবার 'ভাত আর মাছের ঝোল' —ও হতে পারে। কিন্তু 'কিংশুক মাছের ঝোল আর হাত দিয়ে ভাত খায়' কিছুতেই হবে না।

এইবার মনে হল মেঘনা যেন একটু শান্তি পেয়েছে।

নীচের পাড়াগুলোয় ঘর বাড়াও :

- তন্ময় পড়ে।
- রূপা যাচ্ছে।
- আবদুল এসেছে।
- তুমি আসবে?
- আমি যাব।
- পাখি ডাকছে।
- মেরি খেলছিল।
- ফুল ফুটেছে।

যে পাড়াটার মানে আছে তার পাশে (√) দাও। যে পাড়াটার মানে নেই তার পাশে (×) দাও :

• আমি গান।	☐
• বদিউর অঙ্কে ভালো।	☐
• তোমার নাম কী?	☐
• জল পড়ি।	☐
• বাঁকুড়া রাস্তা যাবার।	☐
• দিলীপ ছবি আঁকে।	☐
• নেকড়ের যাব কাছে না।	☐
• কই ভরা ডিম।	☐
• কাল ভোরে সূর্য উঠবে।	☐

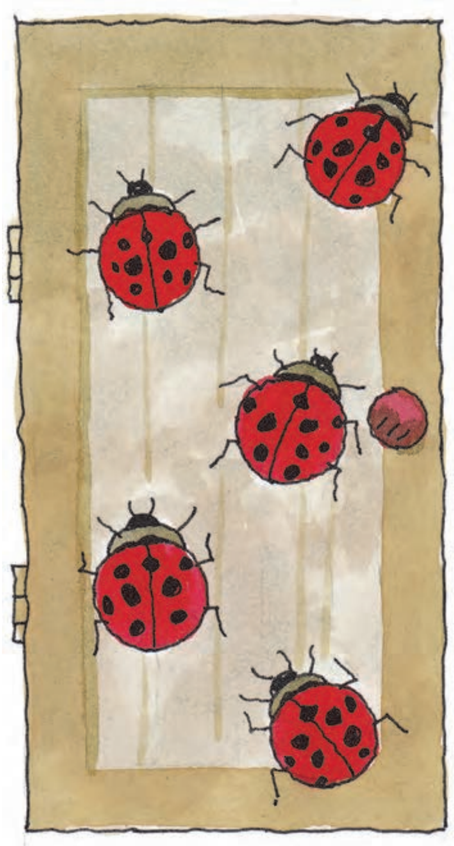

নীচের বাক্যগুলির কোনটি কাজ আর কে কাজ করছে তার নীচে দাগ দাও :

- আমি এখন ছবি আঁকছি।
- কোথায় যাচ্ছ ?
- তার চলে যাওয়ায় কাজটা শেষ হলো না।
- মেঘের পরে মেঘ জমেছে।
- আমি রুদ্রকে বই দিলাম।

অলংকরণ সহায়তা : সুব্রত মাজী

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও:

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও:

শিখন পরামর্শ

- বইটির পরিকল্পনায় রয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন—২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে পাঠ্যবইটি (তৃতীয় শ্রেণি— বাংলা) রূপায়িত হয়েছে। পড়ানোর আগে পুরো বইটি যত্ন নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক পড়ে নেবেন।

- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) '**প্রচলিত গল্পকথার জগৎ**'। ছোটোরা এই বইয়ে নিকোবরি, মারাঠি, সাঁওতালি প্রভৃতি নানান উপকথা যেমন বাংলায় পড়বে, তারই সঙ্গে মজার ছড়া, কবিতা, সাহসিকতার গল্প, মনীষীদের কথা, নদীর গল্প, স্বদেশ কথা, স্বপ্নের কাহিনি, প্রতিবাদের গল্প এমনই নানা বিচিত্র বিষয় পড়বে। এই বিষয়গুলিকে আবার বিভিন্ন পাঠে ভাগ করা হয়েছে। সেই সমস্ত পাঠগুলি আবার ছড়া, গান এবং গল্প দিয়ে গড়া। এরা তুলে ধরে বিভিন্ন রকমের মূল্যবোধ কিংবা অনুভূতি। যেমন প্রথম পাঠটির মূল ভাব হলো কাজ ও তার মর্যাদা। পরের পাঠের বিষয় ছবি। এইভাবে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাহারে গড়ে উঠেছে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই। তবে মনে রাখতে হবে ভাবমূল (Theme) মানে কিন্তু বিষয়ের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয়, একটি গতিময় ঝোঁক। তা শিশু মনের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে না, বরং উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোলায়, ভাবায়, আলোড়িত করে। এভাবেই গড়ে ওঠে শিশুর নিজস্ব অভিব্যক্তি। তাই বইটিকে কাজে লাগিয়ে বদলাতে হবে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। কিন্তু কীভাবে? সহজ ভাবে বলতে গেলে দলগত এবং একক এই দুই উপায়েই। শিশুকে হাতে-কলমে কাজে যুক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর করে তুলে শিক্ষিকা/শিক্ষক তাকে সাহিত্য পঠনের পথ দেখাবেন। অন্যদিকে এই কাজ হবে ছাত্রছাত্রীর জীবন-অভিজ্ঞতা নির্ভর আর বৈচিত্র্যময়। আনন্দদায়ক স্ব-শিখনের পথে তাদের এগিয়ে দেবে। বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের বহু ধরনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে সে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে পারে।

- কিন্তু এগুলো শুধু কথার কথা নয়। এসবই বাস্তবায়িত করা যায়। কীভাবে? ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা যাক। ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সময় আমরা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে নেব। সবসময় এই দল হবে মিশ্র। সেখানে অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকাদের সঙ্গে একই দলে একটু পিছিয়ে পড়ারাও থাকবে। এই দলগুলোর মাঝে আপনি হলেন সেতু। খেয়াল রাখবেন পঠন-পাঠন কখনোই একতরফা না হয়। পড়া আর হাতে-কলমে চর্চা চলবে সমানতালে। আপনাকে পড়ুয়াদের সঙ্গে খোলামেলা কথা চালাচালির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তারপর বিভিন্ন ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে শিশুদের ভাবিয়ে তুলে, তাদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

- এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ছবি। শিশুমনের প্রাথমিক জড়তা কাটাতে এই ছবিগুলি হবে চাবিকাঠি। ধরা যাক গাছের ছবি। বইয়ে থাকা গাছের ছবি দেখিয়ে ছোটো ছোটো প্রশ্ন তৈরি করুন ওদেরও প্রশ্ন তৈরি করতে উৎসাহ দিন। এবার অন্য দলকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে সাহায্য করুন। আপনি চাইলে এই আলোচনা চলার সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরে সবাইকে নিয়ে কোনো গাছের কাছে চলে যান। ওদের দেখতে বলুন। ছবিতে দেখা গাছের সঙ্গে আসল গাছের মিল আর অমিল নিয়ে ছোটো ছোটো প্রশ্ন করুন। ওদের কাছ থেকে উত্তর খুঁজুন। গাছের ছবি আঁকতে বা প্রশ্নোত্তরের ঢঙে লিখতে উৎসাহ দিন।

- লক্ষ করে দেখুন পাঠে ঢোকার আগেই আপনি পাঠের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। তবে আরও অনেক পথ আছে। চাইলে ধাঁধার আশ্রয় নিতে পারেন। গাছকে নিয়ে ছোটো কোনো ধাঁধা বানিয়ে বললেন— বলো তো এটা কী ?

- তাই আমরা সবসময় বিভিন্ন মজার আর আনন্দদায়ক খেলায় তাকে জড়িয়ে রাখব। ধরা যাক স্পষ্ট উচ্চারণে একটি দল পাঠের একটি অংশ পড়ল, সেখান থেকে যুক্তাক্ষর বেছে নিল আরেকটি দল। তারপর শ্রেণিকক্ষের সকলে মিলে যুক্তাক্ষর যুক্ত শব্দগুলি না দেখে লিখল। আবার দলে ভাগ হয়ে সেই শব্দগুলো দিয়ে তারা বাক্যরচনা করল মুখে মুখে। আপনি যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দিয়ে দেখালেন। তা দিয়ে আবার নতুন দুটো শব্দ তৈরি করে, আরেক দলকে আরও কয়েকটা শব্দ তৈরি করতে শেখালেন। এসব ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরের কার্ড ব্যবহার করলে তা শিশুদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়।

- আবার হয়তো ফিরে এলেন ধাঁধায়— 'চাকা ঘোরাই বনবনিয়ে
  হাতে নিয়ে দণ্ড
  হরেক রকম বাসন বানাই
  নিয়ে মাটির মণ্ড' (কুমোর)

বলোতো আমি কে? কোনো ছবিতে গল্প নিয়েও কাজ করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই ভাবে আমরা সবাইকে জড়িয়ে নেব। আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুমন একটানা দশ থেকে পনেরো মিনিটের বেশি কোনো বিষয়ে একাগ্রতা রাখতে পারে না। তাই আমরা তাদের বিচিত্র আনন্দদায়ক

বিষয়ে জড়িয়ে রাখব যাতে তারা কখনই না ক্লান্ত হয়ে যায়। এক এক দিন, এক এক সময় , এক এক রকম। কখনো শুনে লেখা, কখনো শুনে বলা, কখনো ছবি আঁকা, কখনো বর্ণ বিশ্লেষণ, তা থেকে শব্দ, তারপর বাক্য, সেই বাক্য জুড়ে জুড়ে গড়ে তোলা যাক কোনো ভাবনা। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে, '...বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে'— সুতরাং প্রয়োগ বর্জিত যেকোনো শিখন অসম্পূর্ণ। কেননা প্রয়োগের মাধ্যমেই শিশুর আবছা ধাবণা আস্তে আস্তে জ্ঞান ও দক্ষতায় রূপান্তরিত হয়।

- ধরা যাক বইয়ের 'নিজের হাতে নিজের কাজ' গল্পটি পড়ে শোনানোর সময় আপনি এরকম অন্য কোনো মনীষীর কথা গল্পের ছলে বললেন। যার কথা হয়তো ওরা আগের শ্রেণিতে পড়েছে বা শুনেছে। এবার এই বিষয়ে ওদের স্বাধীনতা দিন আঁকতে, লিখতে, বলতে।

  আবার কখনও হয়তো গল্পপাঠ শেষ হলো। যেমন ধরা যাক 'সত্যি সোনা' গল্পের উদাহরণ দিই। আপনিই ছাত্রী/ছাত্রদের বললেন 'সত্যি সোনা' নামটা যেন কেমন? তাই না। এর চেয়ে ভালো নাম হবে, 'কর্মই ধর্ম' বা 'কাজের কোনো বিকল্প নেই'। বলে আপনি ওদের গল্পটার আরও ভালো নাম দিতে বলুন। ওদের দেওয়া নামগুলো বোর্ডে লিখুন। ওদের আলোচনা থেকে উঠে আসা একটি বিকল্প নাম 'সত্যি সোনা'র পাশে লিখুন। এভাবেই গল্প নিয়ে কথা বলতে বলতে বলুন, গল্পটার প্রধান প্রধান জায়গাগুলো তোমাদের কী মনে হচ্ছে বলো দেখি? আপনি হয়তো নিজে থেকে বললেন, চাষি ছেলেকে ডেকে বলল 'শোনো, এই যে আমাদের চাষের জমি দেখছ, এর নীচেই পোঁতা আছে লুকোনো সোনা'।। তারপর........ এভাবে এগোন। ঠিক-ভুল বিচার করতে সাহায্য করুন। সবাইকে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিন। জড়িয়ে নিন। না পারলে সাহায্য করুন অপেক্ষাকৃত এগিয়ে আছে যারা তাদের, একটু পিছিয়ে যারা— তাদের সাহায্য করতে শেখান। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। এবার, গল্প চুম্বক তৈরি হয়ে গেলে, নিজের ভাষায় গল্পটি আবার লিখতে সাহায্য করুন।

- এই ধরনের নানা দিশা বইয়ের 'হাতে-কলমে' অংশে রয়েছে। আপনি সেগুলিকে অবশ্যই কাজে লাগাবেন। মনে রাখবেন তৃতীয় শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থী ভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের পাঠ যাতে স্পষ্ট ভাবে পড়তে পারে এবং পড়ে তা নিজের ভাষায় ছোটো ছোটো বাক্যে প্রকাশ করতে শেখে আমরা সেই চর্চা আরম্ভ করেছি। সুতরাং তাকে সক্রিয়তায় জড়িয়ে বলতে হবে। আর এই ধারাবাহিক চর্চা হবে আকর্ষণীয় ও মজার। এই চর্চায় আনতে হবে বৈচিত্র্য। কোনো ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি যেন শিশুমনে একঘেয়েমির সৃষ্টি না করে। যেমন কোনো শব্দের মিল দিয়ে শুধুই ছড়া-ছড়া খেলা যেতে পারে। আবার কোনোদিন ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে বিতর্কের সূচনাও করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের গল্পটিকে নিয়ে আপনিই হয়তো বললেন, কী দরকার ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের, ওর বোঝা না বইলেই পারতেন। এই বলে আপনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি করে দিয়ে আরও দুয়েকটা মন্তব্য জুড়ে দিয়ে তর্কে ও মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহ দিন। দেখবেন শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠেছে বিতর্ক সভা।
- অর্থাৎ কেবল যে বইয়ের ভোল-বদল ঘটেছে তাই নয় বদলে গেছে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। শ্রেণিকক্ষ মানে প্রাণময়, চঞ্চল, জানতে ও পড়তে উৎসুক একরাশ কচিকাঁচা।
- ওদের পাঠ্যবইয়ের বাইরে আরও অন্যান্য বইয়ের অংশ পড়ে শোনান ও পড়তে উৎসাহ দিন। গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন মুক্ত বহিঃদৃষ্টি আর যেকোনোরকম শিখনে ওদের হাতে তুলে দিন কর্তৃত্বভার।
- এবার আসি ভাষা পরিচয়ের কথায়। নতুন পাঠ্যক্রমের ভাষা-পরিচয় (ব্যাকরণ) শুরু হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণি থেকে। বাক্য দিয়ে এর শুরু। বাক্য- শব্দ- বর্ণ-ধ্বনি এবং ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ-বাক্য এভাবে। এই দুই প্রক্রিয়ায়। মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর কথোপকথনের ঢঙে। যাতে তা হয় পড়ুয়ার মনের কাছাকাছি। কেননা, আমাদের মাথায় আছে জীবন-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা, ব্যাকরণও সেই পথের অনুগামী। এই পাঠও হবে চর্চা-নির্ভর আনন্দদায়ক ও সহজবোধ্য।
- শিশুমনের বিকাশে শিক্ষিকা/শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর জীবন-অভিজ্ঞতা, চারপাশের প্রকৃতি আর বিস্তৃত বিশ্বভুবনকে সংযুক্ত করার চেষ্টা শিক্ষিকা/শিক্ষকদেরই করতে হবে।
- পাঠ্যবইয়ের রসহীন, আনন্দহীন এবং আতঙ্কময় তথ্য-তত্ত্বের মুখস্থ বিদ্যাচর্চা কোনোক্রমেই বিদ্যাশিক্ষা নয়। পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনায় এবং তার অনুশীলনীতে সেই প্রথাবদ্ধ ধরনকে বর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীকে নিয়মিত হাতের লেখা দিতে হবে। হাতের লেখা অভ্যাসের পাশাপাশি শেষ তিন লাইনে হাতের লেখার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ছবি আঁকবে।
- 'হাতে-কলমে' অংশটিকে বিশেষ গুরুত্ব এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষার্থী একতরফা শুনে যাওয়ার পরিবর্তে সক্রিয়তার মাধ্যমে অনেক দ্রুত এবং কার্যকরভাবে শেখে।
- শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রতিটি পাঠ পড়ানোর ক্ষেত্রে বা 'হাতে-কলমে' চর্চার প্রসঙ্গে যেকোনো ধরনের উজ্জীবনী তথা উদ্ভাবনী অংশ সংযোজন করতে পারেন।

- পাঠ্যসূচিতে থাকা গানগুলি শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গেয়ে শোনাবেন, এছাড়া কোনো বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যও নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সমবেত সংগীতে অংশ নিতে উৎসাহিত করবেন। বসন্ত উৎসব, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে হয়, এই গানগুলি সেখানে ব্যবহার করবেন। গানকে গান হিসেবেই ছাত্রছাত্রীদের সামনে রাখবেন। কবিতা হিসেবে নয়। পারলে আরো গান শেখান এবং শোনান।

এই বইটির প্রত্যেকটি পাঠ এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি পাঠ মানে কিন্তু একটি কবিতা বা গল্প নয়। একাধিক কবিতা বা গল্প নিয়ে একটি পাঠ তৈরি হয়েছে। এই পাঠের মধ্যে একাধিক গল্প-কবিতা যে বিষয়ের সূত্রে গাঁথা হয়েছে তা স্পষ্টকরে বলা ও বোঝানো প্রয়োজন।

- পুরো পুস্তকটিই পাঠ্য। অংশবিশেষ পাঠ্য নয়। পাঠদানের ধারাবাহিক গতি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্থির করতে হবে, কিন্তু তা কখনোই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের কথা ভুলে গিয়ে নয়।
- শিশুশিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্ভাব্য সময় ও পাঠসূচি :

মাসের নাম	পাঠ	বিষয়	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি	প্রথম	কাজ	সত্যি সোনা, আমরা চাষ করি আনন্দে, নিজের হাতে নিজের কাজ	ভাষার পাঠ শুরু হবে। চলবে পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয়	ছবি আঁকা	দেয়ালের ছবি, সারাদিন	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
মার্চ	তৃতীয়	প্রকৃতিতে রং	ফুল, আজ ধানের ক্ষেতে	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
এপ্রিল	চতুর্থ	নদী	সোনা, নদী, নদীর তীরে একা	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
মে	পঞ্চম	পর্যটন ও অ্যাডভেঞ্চার	নৌকাযাত্রা, ঢেউয়ের তালে তালে, পর্যটন	যেহেতু মে মাসে গরমের ছুটি পড়ে, তাই এই পাঠ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত হবে
জুন ও জুলাই	ষষ্ঠ ও সপ্তম	গাছ ও ঐক্য, বন্ধুত্ব	গাছেরা কেন, গাছ বসাব, জুঁইফুলের রুমাল একা একা, আরাম, সাথি	জুন মাসের শেষ থেকে আগস্ট মাসের দু-সপ্তাহ পর্যন্ত
আগস্ট	অষ্টম	দেশপ্রেম	মনকেমনের গল্প, দেশের মাটি	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নভেম্বর	নবম দশম	মজা ও আনন্দ তিন রকমের লেখা	কীসের থেকে, আগমনী, উড়ুক্কু ভূত ইশপ, পানতাবুড়ি, ঘুমিয়ো নাকো আর	পূজোর ছুটির জন্য অক্টোবর ও নভেম্বর ধরে এই পাঠ চলবে